দ্বিতীয় দিনের কাহিনী

সৈয়দ শামসুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সারাদিন অত্যন্ত মন্থর কেটে যাবার পর আচমকা রাত নামে, কেননা দিনের ভেতরে স্মৃতি রচিত হবার অবকাশ সম্ভবত আর নেই। প্রথমে বিশাল একজোড়া ডানার মত ছায়াপাত সমস্ত বস্তু এবং অস্তিত্বের ওপর অনুভব করা যায়; পরে, রোদের ভেতরে সারাদিন বিভিন্ন উৎস থেকে বেরিয়ে এসে শব্দগুলো যে স্তব্ধতাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল অদৃশ্য পঙ্গপাল যেনবা, তারা ক্ষান্ত হয়। এখন স্তব্ধতা আবার তার অলৌকিক ফলের মত ক্লান্তি ফিরে পায়; রাত গভীরতর হয়; স্তব্ধতা, পূর্ণতর। তাহের তার গন্তব্য জলেশ্বরীতে এসে পৌঁছোয়। মুমূর্ষু ব্যক্তির মত রেলগাড়ি সংক্ষিপ্ত একটি আর্তধ্বনি তুলে নিস্পন্দ হয়ে যায়; এরপর আর কোনো ইস্টিশান নেই; এখান থেকে গাড়ি আবার উল্টো দিকে যাত্রা করবে। মাঝখানে ঘণ্টাখানেকের বিরতি, অতএব প্ল্যাটফরমে যাত্রীদের উৎকণ্ঠিত কোনো ব্যস্ততা নেই। গন্তব্যে যে পৌঁছোয়, কেবল সে ছাড়া আর সকলেই এখন নিঃশব্দে ক্রমশ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। বাতাসে ভেষজ গন্ধ সে টের পায়; সে আবিষ্কার করে প্রতিটি শ্বাস গ্রহণ তার ইন্দ্রিয়গুলোকে মাত্রায় মাত্রায় নগ্ন করে তুলছে; শরীর যেন শূন্যগর্ভ একটি পাত্র, বাতাসে মৃদু উত্তেজক তরলে তা একটু একটু করে পূর্ণ হয়ে উঠছে। সচেতনভাবে সে নিঃশ্বাস নেয় এবং প্ল্যাটফরমে উদ্যমহীন অনেকটা সময় ব্যয় করে। অচিরে অন্ধকারে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়; অনতিবিলম্বে চটমোড়া শনের ছাদ, কাঠের ফলকে প্রায় অবলুপ্ত অক্ষরে এই জনবসতির নাম, মাল ও ওজনের কল এবং ভগ্নদশা সূচিমুখ রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরুবার পথ তার চোখে পরিষ্কার হয়ে আসে। তাহের পা বাড়ায়। ইস্টিশানটি অবিকল তেমনি আছে, কেবল মলিন হয়েছে আরো; বিবর্ণ, দরিদ্রতর; কিংবা দীর্ঘকাল শহরবাসের ফলে তারই চোখ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যাবত প্রকার উজ্জ্বলতায়। কিন্তু সে-মীমাংসায় না গিয়ে সে পা চালায়; বাইরে বেরিয়ে কিছুই কিন্তু চেনা যায় না আর। মনোহারী, মিষ্টি, কাঠ এবং তৈরি পোশাকের এই দোকানগুলো আগে এখানে ইস্টিশানের বাইরেই ঠিক ছিল না; তার স্মরণ হয়, এখানে প্রকাণ্ড এক মাঠ ছিল; পরিচ্ছন্ন মাঠ নয়, সমতল নয়, সবুজ ঘাস নয়, লোমশ কোনো দেহে নিশ্চিহ্নলোম ক্ষতচিহ্নের মত ছিল জায়গাটা; বস্তুত তা ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই ভাগাড় উধাও হয়েছে, তার বদলে আবির্ভাব ঘটেছে ঠাসবুনোন এই দোকানমালার। প্রতিটি দোকানে উজ্জ্বল পেট্রোম্যাকসের বাতি জ্বলছে বরগা থেকে কুকুরবাঁধা লোহার শেকলে; প্রতিটি দোকানে এখন মানুষ গিসগিস করছে; বাড়ি যাবার আগে যাত্রীরা কেউ খেয়ে নিচ্ছে, কেউবা সওদা করছে। কেবল কাঠের দোকানটিতে আপাতত কারো কোনো প্রয়োজন নেই; এত রাতে কেউ কাঠের প্রয়োজন অনুভব করে না, তবু অভ্যেসবশেই দোকান খুলে আছে নতমুখী দু'টি লোক; সেই লোক দু'টির পাশে ঘুম এখন গুঞ্জন করে। তাহেরের প্রচণ্ড খিদে পায়। অনতিপরে সে মনস্থির করে, মিষ্টির দোকানে কিছু খেয়ে নেবে; বস্তুত আলমারির মিষ্টি তাকে লুব্ধ করে তোলে। দোকানে সে ঢোকে, অতিযত্নে হাতের সুটকেশ নামিয়ে রাখে কাঠের হেলনা বেঞ্চে, তারপর একপাশে জায়গা নিয়ে বসে আলমারির দিকে ক্ষুধার্ত চোখে সে তাকায়। আলমারির কাছে অনেক ক'টি লোক দাঁড়িয়ে আছে; তাদের মধ্যে কে দোকানি, কে-বা পরিচারক সহসা বুঝে ওঠা যায় না; বস্তুত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সে কোনো তফাৎ আবিষ্কার করতে পারে না। এবং তার উপস্থিতি এখন অবিলম্বে কোনো চাঞ্চল্য বা আগ্রহ কারো মনে সৃষ্টি করে না। থরে থরে সাজান খাবার তার ধৈর্যচ্যুত ক্ষুধাকে মৃদু বিবমিষায় বদলে দিতে থাকে, মিষ্টির বদলে ঝালের দিকে সে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে থাকে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আক্ষেপের সঙ্গে নানাপ্রকার ঝোলমাছের কথা তার এখন অনিবার্যভাবে স্মরণ হতে থাকে; এমনকি সে ঘ্রাণ পায় ও অনবরত উসখুস করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে রেলপথের অনেকগুলো ব্রীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং অধিকাংশ রেলকর্মী নিরুদ্দিষ্ট থাকায় ঢাকা থেকে জলেশ্বরীতে পৌঁছুতে পুরো দু'টি দিন তার খসে গেছে। এই দু'দিনে প্রকৃত প্রস্তাবে ঝাল কিংবা ভাত তার মুখে ওঠে নি; মিষ্টি, কলা অথবা বিস্কুটে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। গন্তব্যের সঙ্গে ভাতের কোনো নৈয়ায়িক সম্পর্ক না থাকলেও তার মন এখন গরম ভাতের ভিজে আঠালো গন্ধে আবিল হয়ে থাকে। তার এক প্রকার ধারণা ছিল, কেউ তাকে এগিয়ে নিতে আসবে ইস্টিশানে; কিন্তু সে ধারণাটি ভিত্তিহীন, কারণ ইস্কুলের চিঠিতে এরকম কোনো ইঙ্গিত ছিল না। প্ল্যাটফরমে নেমে সে কাউকে আশা করে নি, এবং কেউ আসে নি বলে ক্ষুণ্ণও হয় নি। তবু এখন মিষ্টির দোকানে বসে তার একবার মনে হয়, কেউ তাকে নিতে আসবার ব্যবস্থা করে থাকলে গন্তব্যে এসে আর কিছু না হোক ডাল-ভাত পাওয়া যেত এবং এই মুহূর্তে তার চেয়ে প্রীতিপ্রদ কিছু হতো না। সে এখন সিদ্ধান্তই করে বসে যে খালি পেটে মিষ্টি খেলে তার পাকস্থলী থেকে সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসবে এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। জীবনে এখন একটিই মাত্র প্রবল ভয় তার— স্বজনহীন কোনো শহরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া। তার শরীর বিশ্বস্ত রকমে ভাল; সে মনে করতে পারে না কবে তার কঠিন রোগ হয়েছে, সাধারণ সর্দি কিংবা অরুচি বাদে। সংক্ষেপে, সে এখন, এখানে অসুস্থ হয়ে পড়তে চায় না। অনতিবিলম্বে বেঞ্চ থেকে উঠে বাইরে যাবার জন্য যখন সে পা বাড়ায় তখন ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে যায়। দোকানের বাম কোণে টেবিলে মাথা রেখে মধ্যবয়সী এক লোক, যাকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কোলাহলের মধ্যে ঘুমদেবীর ভজনায় রত, সে হঠাৎ মাথা তুলে তাকায় এবং অপ্রত্যাশিত একটা হুঙ্কার ছাড়ে। মুহূর্তের জন্যে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেদিকে; ক্রেতাকুল অপ্রস্তুত হয়; সামান্য কিছু লোক স্তম্ভিত হয়ে উৎকর্ণ স্থিরতায় বলীভূত হয়ে যায় এবং এই ভঙ্গিতেই ধরা পড়ে যায় যে এরা দোকানেরই কর্মী। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাদের উদ্দেশে সাধারণভাবে আরো একটি সংক্ষিপ্ত হুঙ্কার ছেড়ে জানায় যে, এরা প্রত্যেকেই নিজ-কাজে অত্যন্ত অমনোযোগী, নইলে বিদেশী এই ভদ্রলোক এতক্ষণ এখানে বসে আছেন, তাঁর প্রতি কারো দৃষ্টি নেই কেন? সে আরো বলে, বিদেশী নিতান্ত বিরক্ত হয়েই চলে যাচ্ছেন এবং যে মুহূর্তে তিনি দোকানের নামায় পৌঁছে যাবেন সেই মুহূর্তেই কেউ আর নিজের চাকুরিতে বহাল থাকবে না। তাহের প্রথমত অবাক হয়, লোকটি যদি ঘুমিয়েই ছিল তাহলে তাকে লক্ষ করল কীভাবে? কিন্তু এই বিস্ময় তার ক্ষণস্থায়ী হয়। মুহূর্তে যা তাকে প্লাবিত করে দিয়ে যায় তা হলো এক প্রকার অপরাধবোধ। তার এহেন সামান্য একটি স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে সে কোনো বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চায় না; বস্তুত সে লোকগুলোর জীবিকাহানির সম্ভাবনায় আরষ্ট হয়ে যায়। মৃদু কণ্ঠে সে বলে, আসলে সে সিগারেট কিনতেই যাচ্ছিল। তার মিথ্যা ভাষণ নতুনতর চাঞ্চল্যের জন্ম দেয়, কিংবা বলা যায় বর্তমান চাঞ্চল্য ঘুচে গিয়ে প্রাচীন স্বাভাবিকতা ফিরে আসে বটে। দোকানের কর্মীবাহিনী আবার কাজে মন দেয়; সে আবার তাদের কাছে অনুপস্থিত, অতএব মনোযোগের অবান্তর হয়ে পড়ে; সেই মধ্যবয়সী লোকটি, অবশ্যই যে এ দোকানের মালিক, আবার টেবিলে মাথা রাখে এবং অতি সন্তর্পণে, যেন কাচের একটি পলকা পাত্র সে নামিয়ে রাখে, এবং ঘুমিয়ে পড়ে তিলমাত্র কালক্ষেপ না করে; ক্রেতারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিষ্টির হাড়ি হাতে ঝুলিয়ে রাতের রাস্তায় সাবলীলভাবে নেমে যায়; যারা দোকানে বসেই খাচ্ছিল তাদের কেউ কেউ সমুখে শূন্য বাসন নিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে সাজান আলমারির দিকে আবার তাকিয়ে থাকে, সম্ভবত মনের মধ্যে খাব-কি-ভাব-না পয়সা-খরচ-করব-কি-করব-না জাতীয় বিতর্কের নীরব অথচ প্রবল কোলাহল শুনতে পায় তারা। তাহের বসে থাকে এবং তাহের বসেই থাকে। কেউ তার কাছে আসে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত করে, কর্তৃপক্ষ তার প্রতি জোর করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলেই কর্মীবাহিনী এখন দ্বিগুণ উপেক্ষা দেখিয়ে তা পুষিয়ে নিতে চায়। সে উঠে পড়ে, এবার বাইরে যাবার জন্যে নয়, যায় আলমারির কাছে এবং তার পছন্দ বলে। আলমারির কাছে রসসিক্ত হাত নিয়ে দাঁড়ান এই লোকটির উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত কড়কড়ে নতুন গামছা জড়ান, সম্ভবত কয়েক ঘণ্টা আগেই সে কিনে থাকবে। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার মানুষকে কিছুটা উদ্ধত কিছুটা বিক্ষিপ্ত করে দেয়; মিশ্রিত সেই মনোভাব এই লোকটির মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সে তার মিষ্টির পছন্দ শোনে কিংবা না, হাত নেড়ে অস্পষ্ট একটি ভঙ্গি করে, যার অর্থ হতে পারে— বুঝেছি, যার অর্থ হতে পারে— বসুন গিয়ে। তাহের আবার তার বেঞ্চে ফিরে যায়, পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে এবং মুহূর্তমধ্যে মনে পড়ে যায় যে খানিক আগেই সে সিগারেট কিনতে যাবার কৈফিয়ত দিয়েছিল; তৎক্ষণাৎ সেই মিথ্যের ওপর ধামাচাপা দেবার জন্যে সে সিগারেট দেশলাই দ্রুত গোপন করে ফেলে খাড়া পিঠে বসে থাকে। এক ছোকরা আসে ভিজে ন্যাকড়া হাতে, তার টেবিল সে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিপুণ হাতে মুছে দিয়ে যায়, এবং প্রায় তার পেছনেই নতুন গামছা পরা সেই লোকটা এসে শাদা বাসনে মিষ্টি নামিয়ে দিয়ে যায়; সে ফিরে যেতে না যেতেই আবার সেই ছোকরা আসে, এবার তার হাতে ন্যাকড়ার বদলে সবুজ রঙের মস্তবড় গেলাশ, গেলাশে ফিকে চুনগোলার মত পানি। সে প্রথমে এক ঢোঁক পানি খায়; পানি তার কাছে অত্যন্ত মিষ্টি বলে বোধ হয়। তার শরীরের ভেতর দিয়ে স্নিগ্ধ একটি নদীর প্রবাহ সহসা শুরু হয়ে যায়; রূপকথায় বর্ণিত ইরান দেশের সুন্দরী যার গ্রীবা এতই স্বচ্ছ যে পান খেলে অধোগামী লাল রস প্রত্যক্ষ করা যায়, এখন তার নিজেকে মনে হয় সেই রকম স্বচ্ছ এবং মনে হয় ভাল করে তাকালে তার শরীরের ভেতর দিয়েও দেখা যাবে ফিকে চুনগোলার মত পানি ধীরে নেমে যাচ্ছে। প্রথমে গেলাশটি দেখে তার মনে হয়েছিল পানি অবিশুদ্ধ সম্ভবত; কিন্তু এখানে অতঃপর আর কোনো ঘটনার অবতারণা করবার ইচ্ছে আদৌ তার না-থাকায় সেই পানিই সে খায় এবং তা মিষ্টি বোধ হয়। তার কণ্ঠ থেকে আশ্চর্যসূচক ধ্বনি বেরোয়, সে আরেক ঢোঁক পানি খায়; তার সন্দেহ হয় পানিতে চিনি মিশান আছে; কিংবা এমনও হতে পারে, বাড়তি চিনির শিরা তুলে রাখবার পাত্রেই হয়ত না-ধুয়ে খাবার পানি ধরা হয়েছে। বস্তুত, এ কথা মনে হবার পর সে আবার চুমুক দিয়ে পানিতে এলাচের গুঁড়ো মেশানো শিরারই স্বাদ পায়। তারপর যখন চা আসে, চায়েও সেই সূক্ষ্ম এলাচের ঘ্রাণ পায়। সে প্রায় নিঃসন্দেহ হয় যে এদের এখানে উদ্বৃত্ত শিরার ব্যবহারই এক প্রকার দস্তুর। এমনকি দোকানের বাতাসটুকুও চিনির গন্ধে গাঢ় এবং মন্থর। তাহের এইসব অচির ও বিনাশী চিন্তাগুলো সংবরণ করে না, বরং এতে তার একাকী বসে থাকার শূন্যতা খানিক সহনীয় হয়ে আসে। বস্তুত মন কখনো শূন্য থাকে না; চিন্তা, স্মৃতিচারণ কিংবা দৃশ্যমান জগতকে অবলেহন না করে মন বাঁচে না। সে চায়ে চুমুক দেয়। কিছুকাল আগের সেই মিথ্যা ভাষণের দায়ে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে পকেট থেকে সিগারেট বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে এবং আড়ালে মুখ নিয়ে ফস করে ধরায়। তখন তার চোখে পড়ে ইস্টিশানের সেই লোকটিকে, যে বেরুবার পথে যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করছিল। যখন তাকে সে টিকিট দিয়েছিল তখন একবারের অতিরিক্ত সে-মুখের দিকে তাকায় নি। এখন, দোকানের বাইরে বাঁশের যে নিচু বেড়া কুকুর-বেড়াল ঠেকাবার উপায় হিসেবে বহাল, তার ঠিক ওপারেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে; তার স্তম্ভিত ভঙ্গিতেই বুঝা যায়, দোকানে সে ঢুকতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়েছে। এক তরুণের সঙ্গে সে এখন কথা বলছে। নিচু গলায় উচ্চারিত কথাগুলো তলিয়ে গেছে গ্রামোফোনের তীব্র গানে, কেবল তার দ্রুত ঠোঁটের সঞ্চালন লক্ষ করা যায়। দু'একবার সে প্রবলভাবে মাথাও নাড়ে, বোধহয় প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো বিষয়ে সে তার অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। তাহের কৌতূহলী হয় এবং চায়ের গেলাশ ধীরে নামিয়ে রেখে সে উৎকীর্ণ হয়ে টিকেট মাস্টার ও তরুণের দিকে আড়চোখে তাকায়। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তার ভগ্নাংশও তার কানে পৌঁছোয় না। সে তখন প্রায় হাল ছেড়ে দেবে, আবার চায়ে চুমুক দিবে এই অবস্থায় একটি সন্দেহ আচমকা তার মনের ওপর ছোঁ দিয়ে যায়; তার সন্দেহ হয় ওরা তাকে নিয়েই কথা বলছে। অচিরেই এ ধারণটি সমূলক বলে প্রমাণিত হয়। সেই তরুণ এবার তাহেরের দিকে চোখেব একটি স্পষ্ট ইশারা ছুঁড়ে দিয়ে টিকিট মাস্টারের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য উচ্চারণ করে। বাক্যটি টিকিট মাস্টারকে বিশেষ ভাবিত করে তোলে, সে দূর থেকে চিন্তাক্লিষ্ট চোখে তাহেরের দিকে তাকায় এবং চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়; তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে আবার সে ভারপিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে; এবার তার মাথা নাড়ায় আগের মত প্রত্যয় বিকীর্ণ হয় না। বরং প্রত্যয়ের অবশিষ্ট বিভাগটুকুও বিলীন হয়ে যায়, বদলে এক করাল অনিশ্চয়তা টিকিট মাস্টারের সমস্ত মুখভারের ওপর দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়; বস্তুত, তরুণের কাছে তার চিন্তাসমেত আত্মসমর্পণ করে। আগন্তক সে, মিষ্টি দোকানের মালিকের বর্ণনায় বিদেশী সে, মনের মধ্যে হঠাৎ এক আশংকাজনিত অস্থিরতা অনুভব করে ওঠে। যেমন হয়, যে-কোনো অজানাই মানুষের মনে এক ভয় মিশ্রিত কৌতূহলের সঞ্চার ঘটায় অবিলম্বে, তাহের কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার চোখ থেকে সমস্ত দৃশ্য উধাও হয়ে যায়, সে কেবল টিকিট মাস্টার আর তরুণটিকে দেখতে থাকে, যদিবা তাদের পরবর্তী অভিব্যক্তি থেকে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু প্রত্যাশা প্রত্যাশাই থেকে যায়। কোনো অজানা কারণে দু'জনেই দ্রুত চলে যায়, অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় তাদের উপস্থিতি; এখানে আবার তারা ফিরে আসবে কিনা, তাদের চলে যাবার ভঙ্গিতে মোটেই তা স্পষ্ট হয় না। সে আরেক গেলাশ চা আদেশ করে। নতুন গামছা পরা লোকটি এসে ছোঁ মেরে তার টেবিল থেকে শূন্য বাসন নিয়ে যায় এবং যাবার সময় এমন এক কঠিন মুখভাব দেখিয়ে যায় যাতে স্পষ্ট হয় যে দোকানের মালিকের সেই কথাগুলোতে এখনো সে অজীর্ণতায় ভুগছে। তাহের চায়ের আশায় বসে থাকে। শিগগিরই চা আসে না। বিরাট কেতলিতে চায়ের জন্যে নতুন পানি চুলয় বসতে দেখা যায়। ভিজে ন্যাকড়া হাতে ছোকরাটিকে এবার পাক দিয়ে যেতে দেখা যায়, তাহেরের কাছে আসতে গিয়েও সে আসে না আর, একটেরে গিয়ে জিরতে বসে, কার কাছ থেকে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ সে চেয়ে নেয় এবং বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নাকে-মুখে অবিরল ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। আরো কেউ-কেউ মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে 'ইস, রাত অনেক হলো' বলতে বলতে বাড়ির দিকে লাফিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। কোনো এক অপ্রত্যাশিত চিন্তার মত তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে হয় দোকানের মালিক যে তাকে বিদেশী বলে বর্ণনা দিয়েছিল তা যথার্থই কারণ, অচিরেই তার চারদিকের সমস্ত কিছু সুদূর এবং অপরিজ্ঞাত বলে বোধ হতে থাকে। এবং এই প্রতিসত্যও তার মনে উদিত হয় যে এখানে এদের কাছেও সে একই প্রকারে অচেনা তথা বহিরাগত। বস্তুত, অধিকাংশ মানুষ জীবনের অধিকাংশ মুহূর্তেই পরিচিত বোধসমূহের অন্তর্গত হয়ে বাস করে; যে-মুহূর্তে সামান্যতম অপরিচয়ের অবকাশ, তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কের কোষে কোষে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম হয় এবং অধিকাংশ মানুষেরই তখন যে-ভাবটি দেখা যায় তা বর্জনের, অস্বীকৃতির, এবং পরিচিত বৃত্তের ভেতরে দ্রুত ফিরে যাবার ইচ্ছার। কিন্তু সে বসে থাকে, সে চায়ের অপেক্ষাই করতে থাকে, কারণ, অন্য মানুষের বিপরীতে, এমনকি তার নিজেরই অভ্যস্ত জীবনের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সে আজ সচেতনভাবে এক অপরীক্ষিত ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছে। অতীতের দিকে সে তাকায় এবং স্মৃতিচারণার জন্যে প্রথম পা ফেলে, কিন্তু কোথায় একটা শেয়াল ডেকে ওঠে, মুহূর্তকাল পরেই ভিন্ন দিক থেকে আরো কিছু শেয়ালের একতান এবার শোনা যেতে থাকে। এই দোকানের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বড় গাছ আছে, আম কিংবা অশথ; বাতাসে তার পাতাপত্রের ভেতরে আচমকা শিহরণ বয়ে যায়; দোকানের টিনের ছাদে ডাল ঘষার প্রশস্ত শব্দ হতে থাকে অতঃপর। হঠাৎ থেমে যায় সব; বাতাস, শেয়ালের ডাক, টিন ঘষা। কাঠের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়, সে দোকানের লোক দু'টির প্রতিযোগিতামূলক কাশি শোনা যায়; অনতিকাল পরেই তাদের দেখা যায় হাতে টিমটিমে লণ্ঠন নিয়ে আসতে। তারা মিষ্টি দোকানে জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরায় এবং নিঃশব্দে নিকষ অন্ধকারের ভেতর নেমে পড়ে। তাহের সচকিত হয়ে লক্ষ করে তাকে চা দেয়া হয়েছে; নতুন পাতায় তৈরি চায়ের ঘ্রাণ তাকে ধোঁয়ার লীলায়িত আঙুলে আদর করে; সে চুমুক দেয়। তারও এখন যাওয়া দরকার; কর্তব্য, রাত্রিবাস করবার সুবিধে কোথায় আছে তা এক্ষুণি জেনে নেয়া; সকলেই বাড়ি যাচ্ছে, ক্রমেই লোক কমে আসছে দেখে তারও ভেতরে এখন দোলা লাগে। সেই দোলা আরো প্রবল হয়ে পড়ে যখন রেলগাড়ির হুইসিল শোনা যায়। অনতিপরে, চাকার নিঃশ্বাসযুক্ত শব্দসমেত রেলগাড়ি জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যায়; বাতাস হঠাৎ দাপাদাপি করে উঠে শান্ত হয়ে যায়; ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে লোকেরা এখন বাড়ির দিকে যায়। তাহের আশা করে ঘরমুখো লোকেদের মধ্যে সে টিকিট মাস্টারকে আবার দেখতে পাবে; ভাল করে তাকায় প্রত্যেকের মুখের দিকে, কিন্তু তাকে আর দেখা যায় না। কিছুকাল আগে তরুণের সঙ্গে সে যে কথাবার্তায় অংশ নিয়েছিল, এখন সেই জটিলতা তাহেরের মনের মধ্যে অমোচনীয় হয়ে দেখা যায়। অবিলম্বে তার ধারণা হয়, চিন্তা করছিল বলেই বিভ্রম দেখছে; কিন্তু না, সেই তরুণ এখন তার নিকটেই সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায় নি; দাঁড়িয়ে আছে, এবং হঠাৎ তাকে একা মনে হলেও অচিরে সে অনুভব করে দূরে আরো যে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে মিষ্টির আলমারি ঘেঁসে তারাও একই উদ্দেশ্যে উপস্থিত ও স্থির। কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য তাহের কল্পনা করতে পারে না; সে একবার একে, একবার তাকে দেখে নেয়, একবার চায়ে চুমুক দেয়, আবার চোখ তোলে। তারা দাঁড়িয়ে আছে, স্থির এবং স্তব্ধ। তাহেরের হাত অজান্তেই তার সুটকেশের দিকে যায়, সেটি সে নিজের কাছে সামান্য খানিক টেনে আনে, যেন প্রমাণ দেবার প্রয়োজন আছে যে আসলেই এর মালিক সে। তরুণ এবার আরো এগিয়ে আসে তার কাছে, কিন্তু তাকে কিছু বলবার আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে ফিরে তাকায় অনুচর দু'জনের দিকে, এবং তারাও এবার এগিয়ে আসে, তবে তরুণ থেকে তারা দূরত্ব বজায় রাখে অবিকল আগের মতোই। তরুণের চোখে মুখে তাহের সেই দীপ্তি দেখতে পায় যা থেকে নেতাকে সনাক্ত করে নেয়া যায় সহজে। তরুণ তার সমুখে এসে নিঃশব্দ হাসিমুখে উল্টো দিকের বেঞ্চে বসে, হাত দিয়ে ইশারা করবার পর তার সঙ্গীরাও ঘনিষ্ঠ হয়, তারা পরের বেঞ্চে বসে পড়ে। তরুণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহেরের যা একটি অনন্তকাল বলে বোধ হয়। তখন তাহেরই প্রথম সরব হয়; সে প্রশ্ন করে, আপনারা কি এখানকারই লোক ? তরুণ সাবলীলভাবে প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি ? এখন, এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে একাধিক। তরুণ কি তার নাম জানতে চায় ? কিংবা পরিচয় ? অথবা, শুধু এখানকারই সে কিনা তার একটি বিবরণ ? এবং এটাও হতে পারে যে প্রশ্নটি আসলে এক সমর্থন প্রত্যাশী উক্তি, যেমন, আপনি কি তবে সেই লোক যিনি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহের স্থির করতে পারে না প্রশ্নের কোন অভিধা ধরে নিয়ে সে উত্তর দেবে, ফলে সে নীরব থাকে। স্পষ্টতই, এ নীরবতা তরুণের মনঃপুত হয় না; অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্নটি সে আবার করে এবং উচ্চগ্রামে। তাহের লক্ষ করে, একটু আগের সেই হাসিটি তরুণের মুখ থেকে এখন সর্বাংশে অন্তর্হিত। তরুণের স্বর এবং মুখমণ্ডলের পরিবর্তন তাহেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে, বিহ্বল করে রাখে, এবং এবারেও সে উত্তর জোগাতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু, একটি জরুরি পরিবর্তন আসে তার নিজের মুখভাবে। সেখানে অস্পষ্ট হাসির আবির্ভাব ঘটে; অনেকটা যেন দলছুট পতঙ্গের মত হাসিটি স্থান বদল করে তরুণের ক্ষেত্র ছেড়ে তার ক্ষেত্রে এসে বসে। তার এই অভিব্যক্তির সঙ্গে কোনো যোগ আছে কিনা বোঝা যায় না, নেতা তরুণের দুই অনুচর সঙ্গে সঙ্গে আরো ঘনিয়ে বসে, বসে এবার তার উল্টো দিকেই। তিনজন পরস্পর গূঢ় দৃষ্টি বিনিময় করে, একসঙ্গে তারা সুটকেশের দিকে তাকায়, আবার তার দিকে তাকায়, আবার নিজেদের ভেতরে দৃষ্টি বিনিময় করে। তাহের তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে; সে টের পায় ঘটনার লাগাম তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। অতএব সে এক দণ্ডে পরিচয় এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দ্রুতকণ্ঠে জানায় যে তার নাম তাহেরউদ্দিন খন্দকার, এ সুটকেশ তার নিজের এবং তার জন্ম হয়েছিল এখানেই। তার নাম বা সুটকেশের মালিকানা শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করে না। একসঙ্গে তিনজনই বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করে, এখানে মানে এই জলেশ্বরীতে ? তাহের চোখ বন্ধ করবার ভঙ্গি সৃষ্টি করে সম্মতিসূচক মাথা দোলায় এবং স্মিতমুখে যোগ করে যে সে ঘটনা আজ থেকে উনচল্লিশ বছর আগে। মনে মনে সে লক্ষ না করে পারে না যে এই তরুণদের জন্ম তখন দূরের কথা এদের মায়েরাই তখন হয়ত পৃথিবীতে আসে নি অথবা এলেও হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু তরুণ মাত্রেই যে একটি বিষয়ে ঘোর অরুচি ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে থাকে তা হলো তাদের জন্ম পূর্ব সময় সংক্রান্ত কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উত্থাপন। অতএব তাহের এখন মুখের অতিরিক্ত প্রসন্নতাটুকু মুছে ফেলে নিতান্ত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। ক্ষণকাল এতে সে ব্যস্ত থাকায় লক্ষ করে না যে তরুণেরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে নিচু পর্দায়। সে মনোযোগ দিতেই তারা চুপ করে যায়; পরে অনুচরদের একজন মাথা নেড়ে অস্ফুটস্বরে জানায় যে তারা এখানকারই ছেলে, চিরকাল এখানেই তারা আছে, তারা নিশ্চিত যে খন্দকার বলে কোনো পরিবার গোটা জলেশ্বরীতে কেন, তার ধারে কাছেও নেই এবং কখনো ছিল না। বাকি দু'জন নীরবে তার সঙ্গে একমত হয়। বাহুল্য হলেও একই কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারা আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণও করে এবং নতুন কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে তাহেরের মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। তাহের ব্যাখ্যা দিতে যাবে এমন সময় দোকানের মালিক সেই মধ্যবয়সী ঘুমন্ত ভদ্রলোক 'এই যে ক্যাপ্টেন ভাই' বলে সটান কাছে চলে আসে এবং অত্যন্ত বশংবদ গোছের নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ঘটনা কী জানতে চায়। তাহের অনুমান করে, নেতা তরুণই উদ্দিষ্ট ক্যাপ্টেন ভাই। সামরিক বাহিনীর কড়া নিয়ম দুরন্ত সিঁড়ি বেয়ে যে এ উপাধি আসে নি তা ব্যক্তিটির উপস্থিত ব্যক্তিত্ব থেকেই স্পষ্ট। বরং যে আভাস লক্ষ করা যায় তাতে মনে না হয়ে পারে না যে এ উপাধি অর্জনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, অনুষ্ঠান-বহির্ভূত এবং চমকপ্রদ; অথবা পথের পাশে বৃক্ষের মতই স্বাভাবিক তার অভ্যুদয়। তাহের অবিলম্বে তার শ্রোতাদের সাধারণভাবে, বিশেষভাবে ক্যাপ্টেনকে, জানায় যে তার বাবার ছিল বদলির চাকুরি, সেইসূত্রে এখানে সাবরেজিস্টারি আপিসে তিনি বছর কয়েক ছিলেন, সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগের কথা, তখন এই জলেশ্বরীতেই তার জন্ম হয়, পরে সে ঢাকায় যায় এবং সেই শৈশবের পরে আর কখনো সে এই উত্তর অঞ্চলে আসে নি। তার বক্তব্য অখণ্ড এক নীরবতার সূত্রপাত করে। নতুন গামছা পরা সেই কর্মীটি কখন এসে শ্রোতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে কিন্তু মালিকের রুষ্ট দৃষ্টিপাতমাত্র তাকে চলে যেতে হয়; সে চলে যায় এবং সশব্দে বাসন-গেলাশ ধুতে থাকে; শব্দের এই অতিরেক যে তার ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না। দোকানের মালিকের কপালে মুহূর্তের জন্যে রেখাপাত ঘটে; কিন্তু সে সিদ্ধান্ত করে, না, কিছু বলা নয়। শব্দ আগের মত হতে থাকে। তাহেরের বক্তব্য শেষের নীরবতা কেবল ঐ ঠকাস-ঠন ধ্বনি ছাড়া আর কিছুতেই বিঘ্নিত হয় না। ক্যাপ্টেন ইত্যবসরে চোখ বুজে মনের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে মীমাংসা রচনায় ব্যস্ত থাকে, তার অনুচর দু'জন উসখুস করে, দোকানের মালিকের মুখ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্রমশ একপ্রকার উজ্জ্বলতা পেতে থাকে। সে, দোকানি, ক্যাপ্টেনের কাঁধে সন্তর্পণে হাত রাখে, ক্যাপ্টেন ধ্যানক্ষান্ত চোখে জিজ্ঞাসা সমেত তার দিকে তাকায়, দোকানি তখন তাকে এবং তাহেরকে একই সঙ্গে উদ্দেশ করে বলে যে ষোলই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর বিহারিরা বস্তুতপক্ষে বহুরূপী হয়ে উঠেছে; ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা যে বাংলা ভাষা এই বিশ বছর বলে নি, বলতে পারে না বলে ভান করেছে, এখন তারা চমৎকার বাংলা বলছে এবং এই একটি সূত্রেই প্রমাণসিদ্ধ হয়ে যায় যে বিহারিদের মনে চাতুরির বিস্তার কতদূর পর্যন্ত, আসলে তারা, বিহারিরা, বাংলাদেশের আত্যন্তিক জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে এখন বিভিন্ন রন্ধ্রে মাথা গলিয়ে ফিরে আসছে; উদ্দেশ্য, আপন বাড়িঘর সহায়-সম্পত্তি উদ্ধার করা। দোকানির এ বক্তব্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তাহেরকে সে ঐ বহুরূপীদের একজন বলেই সনাক্ত করছে; কেবল যেটুকু সন্দেহ তাকে এখনো দোদুল্যমান রাখে তা হলো কার সম্পত্তির উদ্ধারকারী হয়ে সে এখানে আজ উপস্থিত। ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে; সে ভঙ্গিতে দোকানির বক্তব্যের প্রতি সমর্থন কিংবা সন্দেহ প্রকাশ পায়, স্পষ্ট বোঝা যায় না। ক্যাপ্টেন তাহেরের দিকে সম্পূর্ণ বিস্ফারিত চোখে তাকায়। দোকানি এতে উৎসাহিত বোধ করে; টেবিলে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সে জানতে চায়, আসলে তাহেরের বাড়ি কোথায় এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে সে তারস্বরে ঘোষণা করে যে তাহের অবশ্যই আবদুস সালাম মজঃফরপুরীর সাবান ফ্যাক্টরির দখল নিতে এসেছে, কারণ উক্ত বিহারিই ছিল এই জলেশ্বরীতে সবচেয়ে ধনবান এবং মজঃফরপুরী যে ছলেবলে তার সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা

করছে না এ কথা উন্মাদেও বিশ্বাস করবে না। দোকানি ধমক দিয়ে জানতে চায়, উক্ত মজঃফরপুরী এখন কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে অবিলম্বে তা জানা প্রয়োজন, কারণ, তারই সাক্ষাৎ প্ররোচনা এবং নির্দেশনায় জলেশ্বরী বাজারের বাঙালি এগারজন গালা-মালের কারবারিকে মিলিটারি ধরে নিয়ে যায় স্কুলবাড়িতে; সেখান থেকে তারা আর ফেরে নি, ইস্কুলবাড়ির কোনো কোনো দেয়াল ও থামে ঘন কালো দাগ, যা রক্তেরই হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। স্কুলবাড়ির উল্লেখে তাহের হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার এ চাঞ্চল্য দোকানি বা ক্যাপ্টেন কারো নজর এড়ায় না; দোকানি তার হাত খপ করে ধরে ফেলে, অনুচর দু'জন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে পিস্তল বেরিয়ে পড়ে চোখের পলকে। তাহের তখন হেসে ওঠে; পরমুহূর্তে সে আবিষ্কার করে যে ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়, তাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন তারা কাজ ফেলে রাখবার লোক নয়; সে হাসি থামায়, অস্ফুট স্বরে ক্ষমা চায় এবং বলে যে তার আগেই জানান উচিত ছিল, ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি নিয়েই তার এখানে আসা; মহকুমা হাকিম যিনি এই ইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি তিনি স্বয়ং তার সাক্ষাৎকার নেন ঢাকায় এবং নিয়োগপত্র দেন, সেটি তার সুটকেশেই আছে। তার এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত একটি স্তব্ধতার জন্ম হয়। অনুচর দু'জন প্রকাশ্যেই হতাশ ভঙ্গি করে বসে পড়ে, দোকানির কী একটা কাজ মনে পড়ে যেতে 'আসছি' বলে উধাও হয়ে যায় এবং বাসন ধুতে অনাবশ্যক শব্দ করবার জন্যে সে নতুন গামছা পরা কর্মীটির গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন তার পিস্তল লুকোয় না, সে সন্তর্পণে এবং সবার দৃষ্টিগোচরভাবে টেবিলে রেখে দেয়। তারপর তাহেরের মুখের দিকে তিনজনই একবার ভাল করে তাকায়, সুটকেশটিও একবার দেখে নেয় তারা, যেন ওখানে কোনো সমর্থন আবিষ্কার দৃষ্টিপাত মাত্র সম্ভব। অবিলম্বে প্রত্যেকেই চিন্তামগ্ন হয়। অনতিপরে ক্যাপ্টেনকে দেখা যায় জলতল ভেদ করে সে উঠে এলো। সে তার উপাধির সার্থকতা প্রমাণ করে তিনজনের ভেতর প্রথম সে নিজে সজীব হয়ে ওঠে। বিলম্বিত সহাস্যে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন এখন জানায়, হ্যাঁ, অবশ্যই তার জানা ছিল যে ইস্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক ঢাকা থেকে আসছেন। এ বিষয়ে মহকুমা হাকিমের সঙ্গে যে তার গতকালই কথা হয়েছে এটা জানাতেও সে ভোলে না। হঠাৎ অনাবশ্যক উঁচুগলায় সে চার গেলাশ চায়ের হুকুম করে এবং নিঃশব্দে এবার পিস্তলটি পকেটে পুরে তাহেরের দিকে তাকিয়ে সংক্ষিপ্ত এক অর্থহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। তারপর আচমকা উষ্মায় ফেটে পড়ে সে মহকুমা হাকিমের আদ্যন্ত করে এই মর্মে যে গতকাল দেখা হলেও তিনি দয়া করে এটা জানাতে ভুলে গেছেন যে শিক্ষক আসছেন আজ সন্ধের গাড়িতেই। অতঃপর ক্যাপ্টেন দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে এবং জানায়, সরকারি কর্মচারীদের এ হেন গাফিলতি নতুন নয়, এই সেদিন এক শাদা সাহেব এলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তুলতে, তিনি আসবেন সে কথা জানা সত্ত্বেও মহকুমা হাকিম মুক্তিযোদ্ধাদের জানাতে কষ্ট স্বীকার করেন নি, ফলে যা হবার তাই হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকাতে তাদের চট করে একত্র করা গেল না, এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই যেখানে হয় সেই মান্দারবাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো না, সাহেব কী ছবি তুললেন কে জানে, তিনি তো 'ভেরি গুড' 'ভেরি গুড' বলে চলে গেলেন, এখন ক্যাপ্টেনের হয়েছে মুশকিল, তার ছেলেরা এসে রোজ অনুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করছে ছবিতে তারা থাকতে পারল না, অথচ গুলির মুখে দাঁড়াবার সময় মহকুমা হাকিম ছিলেন কোথায় ? মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বিশেষ মহকুমা হাকিমটির কী ভূমিকা ছিল বোধহয় ক্যাপ্টেন সহসা সেই নীরব বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে যায়; অন্যমনস্কভাবে সে চায়ের গেলাশ নিয়ে ধীরে নাড়াচাড়া করে এখন। তাহের একবার মনে না করে পারে না যে জলেশ্বরীতে তার পৌঁছুবার তারিখটি নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত ছিল; কারণ, যুদ্ধের পর রেলের সময় সঙ্গত কারণেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, এমনকি গাড়িটি গন্তব্যে পৌঁছুবে কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই; তাহেরকে তো দু'দুটো ব্রীজ পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে এবং তিস্তা জংশনে জলেশ্বরীর গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে ঝাড়া ষোল ঘণ্টা। কিন্তু সে বিবরণে তাহের এখন যেতে চায় না। অবিলম্বে সে কোনো হোটেলের সন্ধান চায় যেখানে আজ রাতের মত আশ্রয় নেয়া সম্ভব। ক্যাপ্টেন প্রথমত প্রবলভাবে অস্বীকৃত জানায়; ঘনঘন মাথা নেড়ে জানায় হোটেল বলতে এ তল্লাটে কিছু নেই, যা আছে তা হলো সাব রেজিস্টারি অফিসের আশে-পাশে ভাত খাবার কয়েকটি দোকান, সেখানে বাঁশের লম্বা মাচান বাঁধা আছে বিদেশীদের রাত কাটাবার জন্যে। ক্যাপ্টেন সেখানে রাত্রিবাস অনুমোদন করে না এখন; বরং সে দু'একটি নাম করে যাদের বৈঠকখানায় শোবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া সম্ভব। অনুগ্রহ নিতে তাহের অস্বীকার করে এবং পরিণামে তাহেরই জয়ী হয়। তারা ভাত খাবার দোকানের দিকেই অগ্রসর হয়। পথে নেমে তাহের আত্মার ভেতরে শীতল শিহরণ হঠাৎ অনুভব করে ওঠে। ঢাকায় সন্ধের পর লোক বেরোয় না আজকাল, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে গাছ-পালার সারির ভেতর দিয়ে পথ, সে পথে মানুষের সাক্ষাৎ এই প্রায় মধ্যরাতেও পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন জানায়, এই সড়কের নাম শহীদ বরকতউল্লাহ রোড। পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করবার আগের দিন বরকতউল্লাহ এখানে প্রাণ দেয়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তবু ক্যাপ্টেন হাত তুলে ইশারা করে, ঐ যে তার কবর। ক্যাপ্টেন অপ্রাসঙ্গিক একটি তথ্য সরবরাহ করে— বরকতউল্লাহ খুব ভাল ভাওয়াইয়া গাইত। অচিরে শহীদ বরকতউল্লাহ রোড চৌরাস্তায় বিলীন হয়ে যায়; তারা ডান দিনে বাঁক নেয়। ক্যাপ্টেন মৃদুস্বরে ঘোষণা করে, এখন তারা শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড দিয়ে যাচ্ছে। ইস্কুলবাড়িতে বাঙালি সেই এগারজন কারবারিকে মিলিটারি হত্যা করবার পর আনোয়ার হোসেন সেখানে গ্রেনেডসহ হামলা চালিয়ে দু'জন গার্ডকে খতম করে, পরিণামে সে ধরা পড়ে এবং তাকে হত্যা করা হয় তার দেহের একেকটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করে। তার লাশ পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন একবার মাঝখানে কথা থামিয়ে সড়কের পাশে অন্ধকারের দিকে হাঁক দিয়ে বলে, এ-এ-রে, সব ঠিক আছে ? অন্ধকারের ভেতর থেকে তৎক্ষণাৎ কারো গলা শোনা যায়; সে কণ্ঠ আশ্বাস উচ্চারণ করে নীরব হয়ে যায়; আবার স্তব্ধতা এসে অন্ধকারকে ঢাকা দেয়। তারা পা চালায়। শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু সে পথও ফুরোয়। এবার বাম দিকে মোড় নিতে হয় তাদের। তাহের জিজ্ঞাসা করতে যাবে এ সড়কের কী নাম, তার আগেই ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, এ হলো শহীদ গেদুমিয়া লেন। মিলিটারিরা গেদুমিয়ার মেয়েকে ধরে নিতে এলে সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরই একজনের বন্দুক কেড়ে নিয়ে বেয়োনেটের ঘায়ে একজনকে হত্যা করে; তারা তখন বাবা ও মেয়ে দু'জনকেই গুলি করে মারে। মেয়ের নাম ছিল চাঁদবিবি। এই যে গলির পাশেই পুকুর, এর নাম এখন চাঁদবিবির পুকুর। এই পুকুরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চাঁদবিবির লাশ বহুদিন পর্যন্ত ভেসে থাকতে থাকতে পচে গলে যায়। অবিলম্বে পুকুরটি দেখা যায়; অন্ধকার রাতেও কোথা থেকে আলোর অস্পষ্ট প্রতিফলন সেখানে তরলতার সংবাদ দেয়। পুকুরপাড়ে বোধ করি সুপুরির গাছ। বাতাসের ক্ষীণ সঞ্চরণ এখন জীবিতের নিঃশ্বাস পতন বলে ভ্রম হয়। ক্যাপ্টেন জানায় এই পুকুরের ওপারেই ছোট্ট একটি মাঠ আছে, সেখানে খোকাভাই ছেলেমেয়েদের গান শেখাত রোজ বিকেলবেলায়— আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, জয় বাংলার জয়; তাদের পরিকল্পনা আছে এই মাঠে তারা খোকাভাইয়ের জন্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তুলবে। অবিলম্বে তারা পুকুর পেরিয়ে যায়। পুকুর শেষে আবার একটি সড়ক, বড় সড়ক, আড়াআড়ি উঠে আসে এখন; পায়ের নিচে ধুলোর পুরু আস্তরণ টের পাওয়া যায়, পা প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত নিঃশব্দে ডুবে যায়। ক্যাপ্টেন জানায় এ সড়কটির নাম শহীদ সিরাজ আলী রোড। অনিবার্যভাবেই ক্যাপ্টেন সিরাজ আলীর কথা উত্থাপন করে। সড়কের ওপর এক জায়গায় আছে এক কালভার্ট, ময়লা পানি সরে যাবার সরু নর্দমার ওপর; সেই কালভার্টের ওপর সিরাজ আলীকে বাজারের বিহারি রুস্তম কশাই নিজ হাতে জবাই করে। রুস্তমের দোকানের পেছনে থাকত একপাল গরু-ছাগল, জবাই করে বাজারে বিক্রির জন্যে। বাঙালিরা তেইশে মার্চ পাকিস্তানের পতাকা না উড়িয়ে যেদিন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় সেদিন রুস্তম কোনো পতাকাই ওড়ায় নি বলে সিরাজ লোকজন এনে তার সমস্ত গরু-ছাগল নিয়ে যায়। অবশ্য এটা বিপক্ষের বক্তব্য, ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গেই তা জানায়। পরে, পাকিস্তানি সৈন্যরা রংপুর থেকে জলেশ্বরীতে এসে গেলে, প্রথমেই রুস্তম কশাই সিরাজকে ধরে আনে এবং যেভাবে সিরাজ তার গরু-ছাগল জবাই করেছিল বলে তার ধারণা সেই একইভাবে তাকেও সেই একই পথে পাঠিয়ে দেয়। তার নামেই এখন এ সড়ক, শহীদ সিরাজ আলী রোড। ক্যাপ্টেন আরো জানায়, এর শেষ মাথাতেই তারা শহীদ মিনার বানিয়েছে এবং তাহের যদি ইচ্ছে করে একটু এগিয়ে তা দেখতে পারে; তবে শহীদ মিনারের আগেই বাম দিকে যে সড়ক বেরিয়ে গেছে সেটাই তাদের পৌঁছে দেবে ভাত খাবার দোকানে। তাহের ইতস্তত করে; আসলে তার বিবমিষার উদ্রেক হয়, বোধশক্তি আবিল হয়ে আসতে থাকে; চারদিকে সে জীবিতের নিঃশ্বাসের মত বাতাসের সঞ্চরণ শুনতে পায় অজস্র পাতাপত্রের ভেতর। সহসা দূরের কোনো জলধারার মত শেয়ালের নিঃসঙ্গ ডাক সৃষ্টি হয়। রাত অনেক হয়ে গেছে জাতীয় মন্তব্য উচ্চারণ করে তাহের। অচিরেই তারা ভাত খাবার দোকানে এসে পড়ে। ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে একটি স্তিমিত আলোর ইশারা পাওয়া যায়। মৃদু কণ্ঠে কারা কথা বলে। তাদের পায়ের শব্দে সে কণ্ঠ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়; স্তিমিত আলো উধাও হয় নিরন্ধ্র অন্ধকারে। একবার ভুল হয়, আসলে বোধহয় কোনো আলো ছিল না। চোখের পলকে সমস্ত কিছু নিশ্চল স্তব্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন শংকিত সন্দেহের দীর্ঘ লাঙুল সরসর করে মর্ত্যে ঝুলে পড়ে; নাকের ডগায় দোলকের মত সুমিত ছন্দে পাক খায়; গ্রন্থিমোচন করে নতুনতর গ্রন্থির সূত্রপাত ঘটায়। বস্তুত, কিছু ঘটনা আছে যা ইন্দ্রিয়কে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে মানুষের গূঢ় চৈতন্যের মধ্যে বলীয়ানভাবে প্রবেশ করে; এবং নিত্য নিয়ত যাদের ওপর নির্ভর সেই ইন্দ্রিয়গুলো ঐ প্রকার নিয়মভঙ্গের দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে যায়; সংক্ষেপে, যতিহীন বিহ্বলতার জন্ম হয় গোটা অস্তিত্ব জুড়ে। তাহের ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে এসব স্পর্শ করে না আদৌ; সে তাহেরের দিকে স্মিত দৃষ্টি ফেলে জানায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময়গুণেই মানুষ এখন সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। ক্যাপ্টেন তার সিদ্ধান্ত এখন প্রকাশ করে, এতরাতে বাইরে এতগুলো লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে হোটেলের লোকেরা ভয় পেয়েছে। তাহের এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে নীরবে মাথা দুলিয়ে স্বীকার করে নেয় তা এবং হাতের সুটকেশ নামিয়ে রেখে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষা করে সে। আজকাল সে সমস্ত কিছুই স্বাভাবিকতার গণ্ডির ভেতরে চিহ্নিত করে তুলে রাখে; সে স্বাভাবিকতা এতই স্বচ্ছন্দ যে সে নিজের চিৎ পরিবর্তনের সংবাদও ভাল করে রাখে না। অবিলম্বে ক্যাপ্টেন হাঁক দেয়, এ-এ-এ-রে। বোঝা যায় তার কণ্ঠ জলেশ্বরীর সর্বত্র এতটা পরিচিত যে শুধু অব্যয় ধ্বনির উচ্চারণেই তাকে সনাক্ত করা যায়। ভাত খাবার দোকানের ঝাঁপ নড়ে ওঠে, অন্ধকারে আদৌ তা দেখা না গেলেও শব্দের অস্পষ্ট আভাসমাত্র প্রত্যেকে প্রত্যক্ষই করে বস্তুত। তারপর একলোক ঝাঁপের একাংশ তুলে ধরে সন্তর্পণে, জন্মগ্রহণের মত তার মাথা বেরিয়ে আসে, সে স্থিরমূর্তি আগন্তুকদের দিকে তাকায়। হঠাৎ টর্চের তীব্র আলোয় লোকটির মুখ উলঙ্গ হয়ে যায়; অনুচরদের একজনের হাতে ঐ আলোর উৎস; অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে যাবার অনুরণন বোধ হতে থাকে চারদিকে। তৎক্ষণাৎ লোকটির প্রতিক্রিয়া হয় ঝাঁপের ভেতরে পরিচিত অভ্যস্ত অন্ধকারের ভেতরে মাথা টেনে নেবার, কিন্তু সে সুযোগ সে পায় না; অথবা তাকে দেয়া হয় না। ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পুরো ঝাঁপটাই একটানে তুলে ধরে; সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা ঝাঁপ খাড়া রাখতে হাত লাগিয়ে দাঁড়ায়। সেই খোলা পথে প্রথমে ক্যাপ্টেন, পরে ইশারা পেয়ে তাহের, ভেতরে ঢোকে। অনতিপরে অনুচরেরাও ভেতরে এসে যায়; ঝাঁপ সশব্দে পড়ে যায়; বাতাসে ক্ষণকালের জন্যে দোলা লাগে। দোকানের ভেতর টর্চের আলো এখন সন্ধানী ও সচল হয়। দু'পাশে বেড়া ঘেঁসে ঢালাও দু'টি মাচা বাঁধা, তার ওপরে সারি সারি লোক পাশ ফিরে কেউবা চিৎ হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে ঘুমের গর্তে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। টর্চের আলো তাদের ওপর দিয়ে ঘুরে যায়, স্থির হয় শেষ মাথায় গিয়ে, সেখানে দরোজা, সেটি খোলা, তার ওপারে জমাট অন্ধকার, দরোজার খোলা পথে মাছের ও আবর্জনার গলিত গন্ধ চলাচল করে; টর্চের আলো ফিরে আসে। ক্যাপ্টেন তার অনুচরের হাত থেকে টর্চ নিয়ে ঘুমন্ত লোকগুলোর ওপর স্বয়ং এবার আলো ফেলে; দু'একবার অস্থির সম্পাতের পর আলো নিশ্চল হয়ে যায়— যার ওপরে হয় সে লোকটি উপুড় হয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তাহেরের ধারণা হয়, লোকটি জ্বরে ভুগছে, অথবা শীতকাতুরে। সে না ভেবে পারে না যে এখানে এই ঠাসাঠাসি লোকের মধ্যে তার নিজের জায়গা হবে কোথায়? নাকি, পাশে অন্য ঘর আছে? এদিকে, ক্যাপ্টেনের হাতের টর্চ ঘুমন্ত লোকটির ওপর স্থির হয়ে থাকে; ঘুমন্ত সে, কিন্তু স্থানবিশেষে, যেমন হাসপাতাল কিংবা গোরস্তানে, তাকে মৃত বলেও ঠাহর করা অসম্ভব নয়। আসলে জীবন নিজেও জীবনের প্রমাণ নয়। দোকানের যে লোকটি ঝাঁপ তুলে ধরেছিল সে এখন খসখসে গলায় বলে যে ঘুমন্ত এই লোকটি সন্ধে থেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে, তাড়াতাড়ি এশার নামাজ পড়ে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, দীর্ঘদিন পরে ভারতের সঙ্গে পথ খুলে যাওয়ায় গ্রাম থেকে সে জলেশ্বরীতে আসে আজমীর শরিফ যাবার সুযোগ সুবিধে খোঁজ করতে; তার বহুদিনের সাধ আজমীরে খাজা বাবার রওজা মোবারকে যায়। ক্যাপ্টেন টর্চের আলো নিভিয়ে দেয়। আবার অন্ধকারে ঘরের চৌহদ্দি মুহূর্তে উধাও হয়ে বাইরের বৃহত্তর অন্ধকারের সঙ্গে সাবলীলভাবে এক হয়ে যায়। পথে কিংবা ঘরে, মানুষের অবস্থানের আর কোনো তারতম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকে না। এই অনির্দিষ্টতার ভেতরে কয়েকটি মুহূর্ত পার হয়ে যায়। এক ফোঁটা আলোর জন্যে তাহের যখন অস্থিরতা কেবল বোধ করতে থাকে তখন ফস করে আবার টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন হঠাৎ আজমীর শরিফ দর্শনপিপাসু ঘুমন্ত লোকটির ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে নেয় এবং বলবান এক ধাক্কায় তাকে উপুর থেকে চিৎ করে দিয়ে তার মুখের ওপর টর্চের আলো গুঁজে ধরে। কামানো মাথা কিন্তু সুপ্রচুর দাড়ি-গোঁফ মণ্ডিত শীর্ণ একটি মুখ, চোখ তখনো মুদিত, প্রকাশিত হয়; আর একই সঙ্গে অনুচর দু'জন ঘরের দুই প্রবেশপথে গিয়ে নিঃশব্দে পাহারা বসায়। নাট্যশালায় দর্শকের চোখে যা আকস্মিক, অভিনেতৃর কাছে তা ঘটনার অনন্য স্বচ্ছন্দ বিবর্তন মাত্র। বস্তুত, জীবন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সংঘটিত কোনো নাটক দেখছে বলে তাহেরের এখন ধারণা হয়। অচিরে বাঁশের ঢালাও মাচায় দু'একটি সংক্ষিপ্ত ও সাবধানী মচধ্বনি শোনা যায়; কেউ কেউ যে জেগে উঠেছে তা আর গোপন থাকে না। ক্যাপ্টেন আজমীর-পিপাসু মুদিত-চোখ লোকটির দু'গালে মৃদু চাপড় দেয় তাকে সজাগ করতে, কিন্তু ফল হয় না। তখন সে লোকটিকে কাঁধ ধরে টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে দেয়। এবং তার হাতের আলো একই উত্তেজনার সঙ্গে আবার জ্বলে ওঠে। ঘুম কিংবা ঘুমের অভিনয়ে লোকটির মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, কামানো মাথার বিরাট নগ্ন বর্তুলটি এখন প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে যায়; মুহূর্তে সে বর্তুলতা টাল খেয়ে পেছনে সরে যায়, দাড়ি গোঁফের কৃষ্ণতা চকিতে উদ্ভাসিত হয় টর্চের আলো তার মুখ থেকে লাফিয়ে একবার ঘরের চালে ছিটকে পড়ে, তারপর সব অন্ধকার হয়ে যায়। তাহেরের প্রতিবর্তীক্রিয়া হয় পেছনে সরে যাবার; সে পেছনে সরে আসে কিন্তু অপরদিকের বাঁশের মাচার তীক্ষ্ণ মুখগুলো তার পিঠ অকস্মাৎ বিদ্ধ করে, সে আর্ত অস্ফুট শব্দ করে সমুখে এগোয়। তার চারদিকে বাঁশের মাচার মচমচ আর পায়ের দ্রুত দুপদাপ, অনতিপরে এক ধ্বস্তাধ্বস্তির শ্বাসরুদ্ধকর শব্দ হয়। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা যায়; দোকানের লোকটিকে সে তীব্র স্বরে আদেশ দেয় লণ্ঠন জ্বালাবার জন্যে। লণ্ঠন সম্ভবত হাতের কাছেই ছিল; আদেশ কাজে পরিণত হতে তিলেকের বেশি সময় লাগে না। প্রশান্ত ঘুমের পর মানুষ যেমন জেগে ওঠে তেমনি বিলাস-মন্থর মৃদু আলো সবকিছুর ওপর এসে দাঁড়ায়; দূরে দূরে তরল অন্ধকারের মনোরম পাড় তৈরি হয়ে যায় এখন। দেখা যায়, দু'ধারে মাচার মাঝখানে কাঁচা সরু পথটির ওপর আজমীর-পিপাসু লোকটিকে ক্যাপ্টেনের অনুচরেরা ঠেসে ধরে রেখেছে; লোকটি স্তিমিত এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে; বস্তুত, এখনো তাকে মৃতের মতই স্তম্ভিত বলে ধরে নেয়া যায়। ক্যাপ্টেন তার মুখে আবার টর্চের আলো ফেলতেই সে বেড়ালের মত চোখ বোজে। আলো হঠাৎ সরে গিয়ে নিবদ্ধ হয় দোকানের লোকটির ওপর; সেও তৎক্ষণাৎ কুড়ালের শেষ ঘায়ে কাটা জিগা গাছের মত মাটিতে ঝপ করে পড়ে যায়, কিন্তু তুলনা ঐ পর্যন্তই; সে মুহূর্তে চোখ উল্টে দেয়, বেসামাল লুঙ্গি ঠিক করে নেবার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বোধ করে না, সে তার চার হাত-পা অতিকায় কাঁকড়ার মত নাড়াতে থাকে অবিরাম। একপ্রকার গোঙানি শোনা যায় তার। হতচকিত তাহের তাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবে, ক্যাপ্টেন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। মুখের দিকে বিস্মিত চোখ তুলে তাকায় তাহের, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কয়েক মিনিট আগের সেই পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আর এক করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আরো অবাক হয়ে তাহের লক্ষ করে যে, দোকানে যারা শুয়ে ছিল প্রত্যেকেই তারা এখন জেগে উঠলেও যে যার জায়গাঁয় আগের মতই হাত পা ছড়িয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আছে— জেলেরা যেমন নদীর তলে পেতে রাখা জালে মাঝরাতে মাছের ঘাই শুনেও পাটাতনের ওপর সজাগ স্তব্ধ পড়ে থাকে। ক্যাপ্টেন দোকানের লোকটিকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বলে। লোকটি মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় এবং হাউমাউ করে বলে ওঠে যে, সে যা শুনেছে তাইই বলেছে মাত্র, অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব বা অভিসন্ধি তার এক তিলও নেই, বলতে কী সকলেই জানে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় সে বহু লোককে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করেছে, মান্দারবাড়ির আকবর হোসেনকে একাধিকবার সে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের ডাকলে এখনো তারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সাক্ষ্য দেবে। ক্যাপ্টেন শুধু বলে, সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই, যদিও একেকটা লোককে পার করতে সে কত টাকা করে নিয়েছে তাও তার অজানা নয়। একথা শোনামাত্র দোকানের লোকটি 'দুষ্ট লোকে মন্দ বলে' জাতীয় কয়েকটি শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করে আবার মাটিতে ধপাস করে পড়ে যায়, এবার ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরতে। সেখান থেকে শেয়ালের মত তার সুদীর্ঘ হৌ-হৌ-ও শোনা যেতে থাকে। ক্যাপ্টেন পায়ের ধাক্কায় তাকে উঠতে বলে। আবার সে ফস করে উঠে দাঁড়ায়। তখন 'সে দেখা যাবে' বলে ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করে, দোকানে ক্ষুর আছে কিনা? লোকটি উত্তরে যদিও 'আছে' বলে কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষুরের স্থান কোথায় সে ঠিক নির্ণয় করতে পারছে না। অবিলম্বে হুংকার দিয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন, আর তাতেই কাজ হয়। মুহূর্তে একটা খুঁটি বেয়ে সে সরসর ওপরে উঠে যায় এবং চালের সঙ্গে বেঁধে রাখা টিনের সুটকেশ নামিয়ে আনে। তার ভেতর থেকে ক্ষুর বেরোয়। সেটি ক্যাপ্টেনের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এই প্রথম সে সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু কী ভেবে পরক্ষণেই তা পুরনো ভয়ার্ত চেহারা বার করে তার মধ্যে গোপন করে ফেলে। কেবল কণ্ঠার হাড় ঢাকা চামড়ার তলায় তার দেহবন্দি উদ্বেগ ধুকপুক করতে থাকে। ক্যাপ্টেন তার অনুচরদের একজনকে বলে ক্ষুর দিয়ে আজমীর-পিপাসুর গোঁফদাড়ি কামিয়ে আনতে। তাহের আরো একবার সপ্রশ্ন চোখে এবং খানিকটা আহত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত একটা 'কেন' উচ্চারণ করে। তখন ক্যাপ্টেনের মুখে অনেকক্ষণ পর আবার সেই নিরুদ্বেগ স্মিতহাসি ফিরে আসে। সে দোকানের লোকটিকে বলে তাহেরকে যত্ন করতে। লোকটি বুঝে পায় না কোন আপ্যায়নে রুষ্ট দেবতা তুষ্ট হবেন। তাই সে একবার তাহেরের সুটকেশ ধরে টানাটানি করে, আবার হাত-মুখ ধোবার পানি দেবে কিনা জানতে চায়, সেই সঙ্গে এ ঘোষণাও করে যে, জলেশ্বরীতে একমাত্র তার দোকানেই পাকা পায়খানা পাবেন। পরমুহূর্তে সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, ঠিক মাগরিব নামাজের আগে যখন দাড়ি গোঁফওয়ালা ঐ লোকটি এলো তখনই তার সন্দেহ হয়েছিল, একবার ভেবেও ছিল যে জায়গা নেই বলে দেবে, কিন্তু সখেদে সে জানায়, তার মরহুম বাবা বলে গেছেন সন্ধের খদ্দের ফেরাতে নেই। এইবার সে সত্যি তিলেক হাসে এবং নিজেই এতে উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে যে, বাবা ব্রিটিশ আমলের বলে হালের খবর তার মালুম হবার কথা নয়। বাবা বলে যান আর নাই যান, এই সে কসম করছে, মাগরিব কি ফজর, অচেনা লোকের ঠাঁই তার হোটেলে আর হবে না; বলে, সে মানানসই রকমে বুক টান করে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়ায়; যেন এই ঘোষণাতেই ক্যাপ্টেনের দলগত হওয়া গেল। ক্যাপ্টেন মৃদু হাসে, পেছনের খোলা দরোজার দিকে তাকায়। সেখানে অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে নিয়ে গেছে লণ্ঠনের আলোয় ক্ষৌরি করতে। বিনা-সাবান বিনা-পানিতে সে কাজ চললেও কোনো কাতরধ্বনি শোনা যায় না। বস্তুত, নিঃশ্বাসেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো শব্দ নেই। নাট্যমঞ্চের কথা তাহেরের আবার মনে পড়ে যায়; মঞ্চের আড়ালে পরবর্তী দৃশ্যের প্রস্তুতি নেবার নিঃশব্দে সঞ্চরণও এত নিঃশব্দ নয়। দোকানের লোকটিও আবার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। উদ্বিগ্ন মুখে ক্যাপ্টেনের দিকে সে তাকায়, কিন্তু পেছন ফিরে দরোজার দিকে দেখতে সাহস পায় না। ক্যাপ্টেনের দিকে তার তাকিয়ে থাকা দরোজার দিকে তাকাবার অনুমতি প্রার্থনার মত দেখায়। ক্যাপ্টেন এবার উঁচুগলায় দোকানের রাত্রিবাসকারীদের উদ্দেশে ঘুমিয়ে পড়তে বলে; সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও যোগ করে যে, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, সকালে উঠে যে যার কাজে চলে যাবেন। তার গলা মিলিয়ে যাবার পর অখণ্ড এক নীরবতা নামে। দীর্ঘকাল সে নীরবতা কাটে না। তারপর এ-কোণ সে-কোণ থেকে দু'একবার মচ ধ্বনি ওঠে, বোঝা যায় বাঁশের মাচায় কেউ কেউ পাশ ফিরছে। অচিরে সে মচ ধ্বনি ক্রমাগত মচ মচ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। কারো কারো দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়। কেউ অনুচ্চস্বরে 'আল্লাহ গাফুরুর রহিম' বলে। আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আবার শুধু দোকানের লোকটি উদ্বিগ্ন চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। তার কণ্ঠার নিচে উন্মুক্ত ধুকপুকও স্তিমিত হয়ে যায়। বাইরে আকাঙ্ক্ষিত শীতল বাতাস বয়। তার ঝাপটা এসে ঘরের ভেতর গায়ে লাগে। বুঝি আকাশের এককোণে বৃষ্টির মেঘ দেখা দেয়। দু'একটা উড়ো পাতা দোকানের বেড়ার গায়ে আছাড় খেয়ে ফরফর করে লাফায়। তারপর তাও আর শোনা যায় না। বাতাসও আর থাকে না। আবার সেই সারাদিনের গুমোট ফিরে আসে। রাত্রিবাসকারী কেউ কেউ এপাশে ওপাশে নিখোঁজ তালপাখার খোঁজ করে। পাখার ওপর অন্ধকারে হাত পড়ার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু বাতাস তারা করে না। আসলে আত্মার শীতলতা বাতাস আর ফেরে না। অবিলম্বে সিগারেটের তৃষ্ণা বোধ করে তাহের; ক্যাপ্টেনও স্মিত মুখে হাত বাড়ায়। দোকানের লোকটি ত্রস্ত উঠে দাঁড়িয়ে আগুন সরবরাহ করে; তাহের তাকেও একটা সিগারেট দিতে গেলে সে লম্বা জিভ কেটে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারের ভেতরে মাথা টেনে নেয়। ক্যাপ্টেনের প্রতি সম্ভ্রমবশতই সে এতবড় একটা ত্যাগ অবলীলাক্রমে করতে পারে। তাকে এখন দেখা না গেলেও বোঝা যায়, অতি কাছেই সে কোথাও ওত পেতে আছে পরবর্তী সেবার সুযোগের অপেক্ষায়। ক্যাপ্টেন প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে আচমকা তাহেরকে জানায়, ইস্কুল অনির্দিষ্টকাল থেকে বন্ধ, বস্তুতপক্ষে ইস্কুলটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়, মিলিটারি কয়েকবারই ইস্কুল খোলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনো ছাত্র পাওয়া যায় নি, জলেশ্বরীর ত্রিসীমাতেও উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী কোনো কিশোর কিংবা উঠতি-গোঁফ কাউকেই পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন নিঃশব্দে হাসতে থাকে; বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছাত্র উধাও হবার পেছনে ছিল তারই হাত। হঠাৎ হাসি স্থগিত রেখে ক্যাপ্টেন নতুন তথ্য হাজির করে। মিলিটারি ইস্কুলের চারজন শিক্ষককে হত্যা করে, দু'জন শিক্ষক ভয়ে পালিয়ে যায়, তারা আর ফেরে নি, অন্য জেলা থেকে চাকুরি নিয়ে এসেছিল; আর জলেশ্বরীতে এখন একমাত্র উপস্থিত বিক্রমপুরের হেড মৌলবি সাহেব, তবে তিনি জেলখানায়। সেখানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের কারণ অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর বিরোধী। কেউ বলে, মৌলবি সাহেব মিলিটারির পা-ধরা ছিলেন; আবার কেউ বলে দেশ স্বাধীন হবার পর, তাঁরই শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে জেলখানায় পাঠায় যেন বাইরে থেকে তিনি পৈতৃক প্রাণটা না হারান। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ নিরুদ্বেগ, উচ্চারণের গতি প্রেমালাপের মত ধীর; তাহের বিস্মিত না হয়ে পারে না। আবার সে উদ্বিগ্নও হয়। একা সে স্কুল চালাবে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে ?— বিশেষ, এটা যখন উচ্চ বিদ্যালয়, অন্তত আরো দু'জন শিক্ষক চাই। ক্যাপ্টেন নীরবে ধোঁয়া ছাড়ে, নির্মীলিত চোখে সিগারেট উপভোগ করে চলে, যেন এক তরুণ পণ্ডিত শিষ্যকে কঠিন সমস্যা নিয়ে প্রশ্রয়পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখছে এর সমাধান সে করে কীভাবে। কিন্তু তাহেরের কাছে ইস্কুলের সমস্যার চেয়ে অবিলম্বে বড় হয়ে দেখা দেয় অন্য কিছু; তার মনোযোগ এবং কৌতূহল ধাবিত হয় দরোজার বাইরে যেখানে আজমীর-পিপাসুকে ক্ষৌরি করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। সকলেই, বিশেষ করে তাহের, উৎসুক চোখে তাকায় দরোজার দিকে। অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে ঘরে নিয়ে আসে এবং দু'দিক থেকে তারা তাকে শক্ত করে ধরে তার মুখের পাশে লণ্ঠনটা তেজি করে তুলে ধরে। মাথা তো আগেই কামানো ছিল, এখন দাড়ি গোঁফের অভাবে গোটা মুখটা কুমোর বাড়িতে তৈরি বলে মনে হয়। রক্তশূন্য হলদে সে মুখ; চোখ বিস্ফারিত এবং স্থির; বাক স্তম্ভিত। তাহের একবার তার দিকে, একবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়; এই মুহূর্তে কী আশা করা সঙ্গত তা তার জানা নেই। দোকানের মালিক লাফ দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে এসে অত্যন্ত আগ্রহে কী বলতে চায়, ক্যাপ্টেন নীরবে তাকে হাত তুলে থামিয়ে দেয় এবং আজমীর-পিপাসুর মুখের দিকে নিঃশব্দ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন অদৃশ্য তুরপুন দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে তার মুখে গভীর এক রন্ধ্র সৃষ্টি করে চলেছে। তাহের প্রশ্ন না করে পারে না, ক্যাপ্টেন কি এই লোকটিকে সনাক্ত করতে পারছে ? হ্যাঁ-সূচক মৃদু মাথা নাড়ে ক্যাপ্টেন এবং মনের অবশিষ্ট সন্দেহটুকু বিলীন হবার অপেক্ষায় সদ্য পরিষ্কৃত মুখের দিকে সে তখনো তাকিয়ে থাকে। তাহের আবার প্রশ্ন করে, অতঃপর লোকটিকে নিয়ে কী করা হবে ? তাহেরের দিকে না তাকিয়ে ক্যাপ্টেন লোকটির ওপর চোখ ফেলে রেখেই জানায়, অবিলম্বে তার বিচার হবে। তাহের জানে না, কী তার অপরাধ, তবু ক্যাপ্টেনের উচ্চারণেই সে বুঝতে পারে, অভিযোগ গুরুতর। হয়ত সে আবারো প্রশ্ন করত লোকটির অপরাধ বিষয়ে, কিন্তু তার আগেই লোকটি এক কাণ্ড করে বসে। তার শীর্ণ দেহে এতটা শক্তি আছে আগে বোঝা যায় নি; সে এখন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে চিৎকার করে ওঠে, আমি তর বাপের মত। সে চিৎকার দোকানে লম্বমান কোনো লোকের নিদ্রার আশু আঘাত হয় না, কিংবা হলেও তারা সযত্নে তা গোপন রাখে। তখন সারা দোকানে প্রবল স্পন্দমান এক নিঃস্তব্ধতার অবতারণা হয়। ক্যাপ্টেন সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়ান এবং লোকটির গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। কাজ হয় এতেই। লোকটি সদ্য ছেঁড়া লতার মত নেতিয়ে পড়ে; ক্যাপ্টেনের ইশারায় অনুচর দু'জন আবার তাকে দু'দিক থেকে শক্ত করে ধরে বাইরে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন দোকানের মালিকের উদ্দেশে বলে, তাহেরকে বিছানা করে দিতে, এবং সতর্ক করে দেয় কোনো প্রকার অসুবিধে যেন তার না হয়। আর তাহেরকে সে বলে, আপনার তো যেতে হবে হাকিম সাহেবের কাছে ইস্কুলের চাবি নিতে, সকালে দোকানের মালিক আপনাকে যাবার পথ দেখিয়ে দেবে। ক্যাপ্টেন দরোজা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তার পেছনে পেছনে অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে নিয়ে রওয়ানা হয়। দোকানের লোকটি দ্রুত হাতে বিছানা করে দেয় এবং নিঃশব্দে অপেক্ষা করে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। তাহের হাতের ভঙ্গিতে জানায় যে তার আর কিছু লাগবে না। সে শোবার আয়োজন করে। দোকানের লোকটি অন্ধকারে আবার মিশে যায়। সমস্ত ঘরে নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। কোথা থেকে একটা মশা আসে এবং অবিলম্বে গুঞ্জন করে ফেরে। একটু একটু শীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে। তাহের উঠে বসে সুটকেশ থেকে চাদর বের করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে নিতেই তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় অপ্রত্যাশিত একঝলক বাতাসের মত। অচিরে বাতাসটা সরে যায়, তাহের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু আর সে ফিরে আসে না। তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাহের পাশ ফিরে শুতে যাবে এমন সময় বহুদূরে একটা শব্দ এবং তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। শব্দটা আগ্নেয়াস্ত্রের। শব্দটা তার মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু সত্যই হোক আর বিভ্রমই হোক, সে প্রবল বিচলিত বোধ করে; তার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ দ্রুত তালে চলতে থাকে; একবার সে উঠে বসে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না। তারপর সে যখন ঘুমের হাত ধরে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা নেয়, তখন মনে হয় অদূরে কাদের যেন অনুচ্চ কণ্ঠ। সেটাও সত্য বলে মনে হয় না তার। সে যেন শুনতে পায় ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ-স্বাক্ষর, এ-রে-এ-এ-এ। প্রান্তর পেরুনো সেই ডাক তাহেরকে এক ধাক্কায় জাগরণ থেকে ঘুমের অতলে ফেলে দেয়। সারারাতে আর একবারও সে জেগে ওঠে না। বহুকাল পরে এ রকম একটা রাত সে অতিবাহিত করে যখন ঘুম বিঘ্নিত নয়, শয্যা বিপন্ন নয়। সকালে উঠে আধ-ভাঙ্গা মনে পড়ে তার, সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল; স্বপ্নে একটাই মাত্র স্থিরচিত্র এখন মনে পড়ে তার। জলেশ্বরীতে আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে সে যে নিম্ন বিদ্যালয়ে যেত, বিদ্যালয় ভবনটি ছিল পরিত্যক্ত একটি থিয়েটার হল, তারই অব্যবহৃত ওপরের তলায় ভাঙ্গা গ্যালারিতে সে টিফিন পিরিয়ডে বসে আছে জীবন-বাজারে হারিয়ে যাওয়া তার বন্ধু রঞ্জিত কুমার ধরের সঙ্গে, এবং চিনাবাদাম খাচ্ছে। রঞ্জিত এখন কোথায়? শয্যায় বসে মনে মনে এই নিয়ে সে আন্দোলন করে। বাঁশের চাটাই দিয়ে গড়া দরোজা ঠেলে ভেতরে আসে দোকানের লোকটি এবং হাত কচলে জিজ্ঞেস করে, তাহেরের চা চাই কিনা, তাহলে সে এক্ষুণি কাছারি পাড়ায় গিয়ে স্টল থেকে কিনে আনতে পারে, তার এখানে ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছু হয় না। তাহের তাকে নিরস্ত করে বহু কষ্টে, সে কাছারি পাড়ায় চা আনতে যাবার জন্যে ছিল বদ্ধপরিকর। তাহেরের নিষেধে সে হতাশ এবং বাকহারা হয়ে যায়। পর মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার। তাহলে চাট্টি গরম ভাত চাপিয়ে দিই? আপনি ততক্ষণে গোসল করে নিন; পানি তোলাই আছে এবং রোদে গরম দেয়া হয়েছে। দোকানের এই লোকটি যে তাকে এক মুহূর্ত রেহাই দিচ্ছে না, তার কারণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সে এখানে এসেছিল। ক্যাপ্টেনের কথা মনে হতেই তাহেরের মাথার ভেতর একটা কথা ছোঁ মেরে যায়। জিগ্যেস করে, কাল রাতে সত্যি সত্যি একটা গুলির শব্দ সে শুনেছিল কিনা। কথা শেষ হতেও পারে না, দোকানের লোকটি হঠাৎ পাংশু মুখে প্রবল মাথা নাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্খলিত কণ্ঠে জানায়, না, সেরকম কিছু তার কানে যায় নাই। তাহের আবারো যখন একই প্রশ্ন করে যে, আওয়াজ একটা হয়েছিল এবং সে ঘুমিয়ে ছিল না, তাই স্বপ্নে শোনা বলে ভুল করা অসম্ভব। তখন দোকানের লোকটি এক ব্যাখ্যা হাজির করে। কাছেই এক বিরাট বাঁশবন আছে; হয়ত বাতাসে কোনো পাকা বাঁশ নুয়ে গিয়ে থাকবে আর তারই ফলে ট্যাশ জাতীয় শব্দটি গুলির শব্দ বলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা ষোলআনা। 'আপনার পানি দেয়া আছে' বলে লোকটি ঢিলের মুখে মাথা বাঁচানোর ভঙ্গিতে পালিয়ে যায়। তার এই অদ্ভুত আচরণের কোনো অর্থ আপাতত সে উদ্ধার করতে পারে না; চিন্তিত মুখে সে মুখ ধোবার জন্যে বাঁশের মাচায় পাতা শয্যা থেকে নিচে মাটিতে নামে; নামতে হয় প্রায় লাফ দিয়ে, কারণ মাচাটি বুক সমান উঁচু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাইরে বেরিয়ে দেখে হোটেলবাসীরা পেছনের উঠানে সারি দিয়ে প্রায়-উপুড় হয়ে বসে কোরাসে প্রচণ্ড শব্দ করে গলা-জিভ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। সবাই তার দিকে একবার ফিরে তাকায় এবং কর্তব্য তখন অকস্মাৎ নীরবতার মধ্যে সম্পাদিত হতে থাকে। জীবনকে এরা ভিন্নভাষী অন্যদেশী বলবান এক প্রভু গণ্য করে এবং সেই প্রভুটির নানা জটিল মনোভাব তারা জানাবার আদৌ চেষ্টা না করে নিরুদ্যম থাকাটাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। অতএব, এরা কোনো কিছুতেই চমকিত নয়, দুঃখিতও নয়; বস্তুত, সমস্ত কিছুই এদের কাছে স্বাভাবিক। তাহের একবার ভাবে, এদের কাউকে সে জিগ্যেস করবে কাল রাতে ঐ শব্দটি সম্পর্কে। কিন্তু অচিরেই সে আশা সে ত্যাগ করে। লোকেরা ভালভাবে অঙ্গ ধুয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। তাহের প্রাতকৃত্য শেষে দোকানের লোকটির কাছে হাকিম সাহেবের ঠিকানা নিয়ে পথে নামে। সুটকেশটা রেখে যায় দোকানের জিম্মায়। লোকটি তাকে হাকিম সাহেবের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চায়; তাহের আরো একবার তাকে নিরস্ত করে। যাবার আগে বলে যায়, ক্যাপ্টেন যদি আসে তাহলে তাকে জানাতে যে সে তাকে আরো একবার দেখতে আগ্রহী। ভাত খাবার দোকান থেকে বেরিয়ে নোংরা একটা ছোট্ট মাঠ পেরুলেই শহীদ সিরাজ আলী সড়ক। ভোরের নির্মল আলোয় পথের ধুলো মনে হচ্ছে নরোম একটা গালিচা। মৃদুঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একটা গরুর গাড়ি পাশের আমগাছের নিচে শিশিরসিক্ত দাঁড়িয়ে আছে; তার ছইয়ের ভেতর থেকে, আব্রু হিসেবে ঝোলান ছেঁড়া শাড়ির পর্দা তুলে পাড়াগাঁর এক বর্ষিয়সী তাকিয়ে আছে পথের দিকে। কাছারিতে সম্ভবত জমি সংক্রান্ত তার কোনো মামলা আছে। তাহেরের মনে পড়ে যায়, তার বাবা যখন এখানে সাব-রেজিস্টার ছিলেন, তখন ভোরবেলায় কাছারির সামনে এমনসব আগন্তুকের কৌতূহলী চোখ সে দেখেছে। সেই চোখগুলো মামলা-মোকদ্দমার কুটিলতা মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হয়ে এরকম ভোরের দিকে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাদর গায়ে যে লোকটা দাঁতন করতে করতে অলস পায়ে কোথাও যাচ্ছিল, তাহের তাকে হাকিম সাহেবের কুঠির কথা জিজ্ঞেস করে। লোকটি দৈনন্দিন কণ্ঠে জানায়, সেদিকেই সে যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করলেই তাহের পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু কুঠিতে গিয়ে শোনা গেল, হাকিম সাহেব এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি; আর্দালি ভ্রুকুঞ্চিত করে সন্দেহ প্রকাশ করে, হাকিম সাহেব আপিসের দরকারে বাড়িতে হানা দেয়া হয়ত নাও পছন্দ করতে পারেন। নরম সুরেই সে এ সন্দেহ প্রকাশ করে; তিলমাত্র রুষ্টতা লক্ষ করা যায় না, সম্ভবত তাহেরের শহুরে পোশাক ও মার্জিত চেহারার জন্যে। তখন 'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব' বলে তাহের কুঠির বারান্দায় বহুকালের ব্যবহারে মসৃণ বেঞ্চের ওপরে বসে পড়ে এবং সিগারেট ধরায়। তার ছেলেবেলাতে এই কুঠি ছিল গোরা সৈন্যদের আস্তানা। তখন জলেশ্বরীর ইস্টিশান, পোস্টাপিস, কাছারি সর্বত্র গোরা সৈন্য মোতায়েন ছিল। কানে টেলিফোনের মত একটা যন্ত্র লাগিয়ে, পা লম্বা করে, তারা ইংরেজি বই পড়ত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। তাহের এবং ছেলেরা দূর থেকে তাদের একদৃষ্টে দেখত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অন্যজগতের মানুষ বলে মনে হতো তাদের। এমনকি, তাহেরের মা, তিনিও দুপুরের রান্না এবং অন্যান্য কর্তব্য শেষ করে, গোসল করে, ভাত খেয়ে, জানালার পাশে এসে দাঁড়াতেন, খিড়কি একটু ফাঁক করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন গোরা সৈন্য দেখবেন বলে। মা'র ভাগ্য ভাল তিনি আগেই গত হয়েছেন, মিলিটারির অন্য একটা চেহারা দেখবার মত দুর্ভাগ্য তাঁর হয় নি। ভোরের এই বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাহের এক অলস অনাবিল প্রশান্তি গভীর খাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রবাহিত হতে দেখে। মনে হয়, সমুখে সময় অনন্ত; কোনো কিছুতেই অস্থির গতিবান হবার আবশ্যকতা আর নেই। অতি সম্প্রতি তার জীবনে যা ঘটেছে, তাও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে তার চেতনা থেকে। তাহের নিজেকে অসাধারণ রকমে প্রস্তুত বোধ করে আগামীর জন্যে। তবে, স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, সেটা মনে পড়ে দূর থেকে দেখা ছবির মত, স্থির একটা ছবির মত, ব্যক্তিগত একটা সম্পত্তির মত। ঢাকায়, তার বাসায় মিলিটারি এসেছিল, যে ইস্কুলে সে শিক্ষকতা করত সেখানে বাংলাদেশের পতাকা কেন ওড়ান হয়েছিল, কারা উড়িয়েছিল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে। কিন্তু অচিরেই বেপথু হয়, তারা আকৃষ্ট হয় তার স্ত্রীর দিকে; অথবা, যেহেতু তারা ধারণা করেছিল, সে সত্য কথা বলছে না, তাই চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে মনোযোগ দিয়েছিল তার স্ত্রীর দিকে। অচিরে, তার স্ত্রীকে তারা ধর্ষণ করে এবং বাসা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না জাতীয় ধমক দিয়ে চলে যায়। স্ত্রীর জন্যে সে তখন ঔষুধ আনতে বেরোয়, এবং ঘণ্টা দু'য়েক পরে ওষুধ কোথাও না পেয়ে বাসায় ফিরে দেখে, স্ত্রী ছাদে বিজলি-পাখার আংটা থেকে পরনের শাড়ি গলায় ঝুলে আছে। ভোরের আকাশে এখন সন্ধানী আলোর মত উজ্জ্বল রশ্মি বিকিরিত হয়; হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে তাহের আরো একটি ধরায় এবং সযত্নে সচেতনভাবে পরিপার্শ্বের দিকে মনোযোগী হবার চেষ্টা নেয়। আর্দালিটি অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে; হয়ত তাকে চোখে-চোখে রাখবার জন্যে, হয়ত নিতান্তই কৌতূহলবশত নবাগত মানুষটিকে সে দেখে চলে। তাহের তাকে জিজ্ঞেস করে যে হাকিম সাহেব সাধারণত ঘুম থেকে ওঠেন কখন ? 'তার কোনো ঠিক নাই' বলে আর্দালিটি আবার স্মিতমুখে তাকিয়ে থাকে। তখন তাহের উঠে দাঁড়ায় এবং বারান্দায় পায়চারি করে; ক্রমে তার পদচারণার গতি দ্রুততর হয়, শেষ পর্যন্ত তা কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার মহড়ার রূপ ধারণ করে। এতে সে এতটাই নিবিষ্ট ছিল যে কখন কয়েকজন কৌতূহলী লোক অদূরে সমবেত হয়েছে তা চোখে পড়ে না; যখন পড়ে, তখন সে হঠাৎ থামে, কী-করছিল তা উপলব্ধি করতে পেরে ঈষৎ অপ্রতিভ হয়, ফিরে যায় বেঞ্চে এবং অবিলম্বে বসে পড়ে। সেদিন সন্ধে থেকে কারফিউ ছিল, তাই সে রাতে স্ত্রীকে দাফন করা যায় নি; দাফন হয় পরদিন দুপুরে। দুপুরে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল এবং একই সঙ্গে রোদ ছিল। বুড়ো একটা লোক বেঞ্চে তাহেরের পাশে বসে পড়ে, ক্ষণকাল উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চায়, সে ঢাকা থেকে আসছে কি না ? তাহলে তার কাছ থেকে জরুরি কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, একথা কি সত্য যে, এদেশ এখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে ?— একথা কি সত্য যে, এদেশের সমস্ত সোনাদানা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে ?— একথা কি সত্য যে, শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্যে আর ছুটি পাওয়া যাবে না ?— এ কথা কি সত্য যে, হিন্দুরা অচিরেই ফেরত আসছে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির দখল নিতে ? বুড়ো লোকটি প্রবলবেগে কাশতে কাশতে জানায় যে, ১৯৫০ সালে কয়েক বিঘা জমি সে নগদ টাকায় রেজিস্ট্রি করেই জনৈক হিন্দু পাট-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিল। এখন যদি সে ফিরে আসে তাহলে তো সম্পত্তি তাকে ফেরত দিতেই হবে, যা দিনকাল, হয়ত জোর করেই কেড়ে নিয়েছিল বলে দু'পাঁচ বছর জেলও হয়ে যেতে পারে। বুড়ো লোকটি সত্যি সত্যি ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়ে এবং সম্ভবত জেল-বাসের সম্ভাবনায় আবার তার প্রাভাতিক কাশিটা প্রবল বেগে ফিরে আসে। আর্দালিটি হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে; মুহূর্তে মুখের স্মিত হাসিটি নিঃশেষে মুছে ফেলে সে এক প্রকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাঠিন্য সেখানে আমদানি করে এবং সটান হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো লোকটি নিমেষে বারান্দা দিয়ে নেমে যায় নিঃশব্দে; তাকে দূরে থাক তার কাশির ক্ষীণতম শব্দেরও আর সন্ধান পাওয়া যায় না। হাকিম সাহেব 'আরে, আপনি এসে গেছেন' বলে তাহেরের সামনে এসে দাঁড়ান। দ্রুত কুশল সংবাদ নেবার পর তিনি আর্দালিকে হুকুম দেন 'বাজে লোকের ভিড় যেন না হয়' এবং তাহেরকে ইশারা করেন অনুসরণ করতে। অচিরে তারা কুঠির পেছনে মজা পুকুরের পাড়ে এসে উপস্থিত হয়। পাড় ঘেঁসে সুপুরি গাছ, বয়োবৃদ্ধ গাছের সার, তাতে আর ফল ধরে না, নিশানবিহীন দণ্ডের মত তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে। হাকিম সাহেব, স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রতি প্রভাতে এখানে মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে বেড়িয়ে থাকেন। ঢাকায় তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, নগরীর ভিড় ব্যস্ততা এবং রাজকর্মচারীদের স্রোতে অসহায়ভাবে তাড়িত উৎক্ষিপ্ত একটি বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা; এখন এই জলেশ্বরীতে তাঁকে দেখায় মরাখালে বিলাসী বজরার মত। তাহেরের আগে আগে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, তারো চেয়ে দ্রুতগতিতে একরাশ বক্তব্য উপস্থিত করেন হাকিম সাহেব। প্রথমে তিনি তার প্রশংসা করেন, নগরী ছেড়ে এই অখ্যাত পশ্চাদপসর মহকুমা শহরে আসবার জন্যে। এ কথাও তিনি জানান যে, ব্রিটিশ আমলে বঙ্গ প্রদেশে জলেশ্বরীই ছিল সবচেয়ে পেছনের মহকুমা এবং মানুষের চেয়ে এখানে মশার সংখ্যা বহুগুণে বেশি, তার ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে ম্যালেরিয়া বাহক মশা, আর মানুষের ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে শিক্ষাবিমুখ, কর্মবিমুখ, প্রগতিবিমুখ। পরমুহূর্তে হাকিম সাহেব বক্তব্য সংশোধন করে জানান যে, কর্মবিমুখ বললে এই বোঝায় যে কর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা আছে এবং সে ধারণা থাকা সত্ত্বেও কর্ম তাদের উৎসাহিত করে না; কিন্তু জলেশ্বরীর ক্ষেত্রে মানুষেরা যে ঐ রকম কোনো ধারণা পোষণ করে তা বোধহয় সত্য নয়, বস্তুতপক্ষে, এখানকার মানুষ অজ্ঞান এবং সেটাই ন্যায্য সিদ্ধান্ত। হাকিম সাহেব সখেদে এবং এক প্রকার সহর্ষে জানান যে, ব্রিটিশ আমল থেকে বিগত সিকি শতাব্দীতেও এ অবস্থার তিলমাত্র পরিবর্তন হয় নি। আসলে, কোনো বৃদ্ধ ইংরেজ আইসিএস যদি এখানে আসেন তাহলে তিনি সেই একই জলেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাবেন। হাকিম সাহেবের কণ্ঠে যে হর্ষ তা বোধহয় এই জন্যে যে, তিনি এই পশ্চাদপসর মহকুমা শহরকে নিজের এমন এক ক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন যেখানে আত্মতুষ্টির ফসল অনায়াসেই করতে পারবেন। হাকিম সাহেব যখন তাঁকে এই মজাপুকুরের পাড়ে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, তখন, স্বীকার করতে বাধা নেই, তাহের একটু অবাক হয়েছিল; এখন সে একটু একটু বুঝতে পারে যেন, যে, এমন কিছু কথা তাঁর, হাকিম সাহেবের আছে যা নিরালায় বলবার দরকার আছে। কিন্তু কী সেই কথা ?— পরিষ্কার হয় না; হাকিম সাহেব একটি প্রশ্নেই অতঃপর নিজেকে নিযুক্ত রাখেন, আর তা হলো— তাহের কেন ঢাকা নগরী ছেড়ে জলেশ্বরীতে এসেছে ? বস্তুত, হাকিম সাহেব সাবধানী মানুষ; তিনি প্রশ্নটি সরাসরি করেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটির দিকে বারবার তাহেরকে দাঁড় করাতে চান। তাহের তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে ব্যগ্র বোধ করে না; স্ত্রীর চেহারা দু'একবার তার চোখের ভেতরে ফিরে আসে, সে মাথা নেড়ে তার বিলুপ্তি ঘটায় প্রতিবার; এবং সংক্ষেপে বলে, যে, আপাতত কোলাহল থেকে দূরে থাকাই তার উদ্দেশ্য। কোলাহল ? কিছুক্ষণ ভ্রু গেঁথে মাটির দিকে, মজা পুকুরের দিকে, সবুজ পানার দিকে তাকিয়ে থাকেন; বোধহয় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন— এ বিষয়ে এক্ষুণি কোনো মীমাংসার প্রয়োজন নাই। তিনি, হাকিম সাহেব, অকস্মাৎ তাহেরকে ভিন্ন একটি প্রশ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেন; তাহের কী উত্তর দেবে ভাবে, সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই তার মাথায় আসে না; শেষে বলে, যে, ঢাকায় আওয়ামী লীগের কারো সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, অতএব তার পক্ষে কথা দেয়া সম্ভব নয় হাকিম সাহেবের বিষয়ে কোনো সুপারিশ সে করতে পারবে। তাহের বিস্মিত হয়, তার মত সামান্য একজন ব্যক্তির কাছে, প্রথম পরিচয়েই হাকিম সাহেব এহেন সাহায্য কেন প্রার্থনা করে বসলেন। তাহের বিদায় নেবার সময় হাকিম সাহেবকে বলে যায়, সে আশা করে তাঁর বদলি শিগগিরই হবে। যখন সে বিদায় নিয়ে চলে আসে, হাকিম সাহেব পেছন থেকে আরেকবার জিগ্যেস করেন, তাহলে সে ইস্কুলে জয়েন করছে? হ্যাঁ, সে করছে, জয়েন করবে বলেই এসেছে। ভেবে চিন্তে কাজ করবেন, স্থানীয় টানাপোড়েনে জড়াবেন না— এ জাতীয় একটা কথা হাকিম সাহেব শেষ উপদেশ হিসেবে ছুঁড়ে দেন। তাহেরের এমত বোধ হয়, একটি লোককে সে খোদিত কবরের সমুখে দাঁড় করিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে আসে। আবার সে জলেশ্বরীর ভেতর দিয়ে হাঁটে। তার একবার মনে পড়ে, জলেশ্বরীর তীর্থস্থানটির কথা— হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজার; মাজার ঘুরে এলে মন্দ হয় না— এই ভেবে সে চৌরাস্তায় দাঁড়ায় এবং মনে করতে চেষ্টা করে মাজারটি যেন কোন রাস্তায় ছিল। অনেক ভেবেও সে ঠাহর করতে পারে না, অথচ তার যতদূর মনে পড়ে, মাজারটি শহরের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত, এই ভোরবেলায় সে তো শহরের ভেতর দিয়েই এসেছে অথচ চোখে পড়ল না কেন?— সে বিস্ময় বোধ করে; সে অগ্রসর হয়। এখন পথে আরো অনেক মানুষ, সকলেই যেতে যেতে তার প্রতি কৌতূহলী চোখ ফেলে এগিয়ে যায়, চোখের ঐ দৃষ্টির জন্যেই তাদের কারো কাছে আর জিগ্যেস করা হয়ে ওঠে না যে মাজারটি কোথায়; সে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। তার মাথার ভেতরে অকস্মাৎ হাকিম সাহেবের একটি কথা নড়েচড়ে খাড়া হয়ে ওঠে; মজা পুকুরের পাশে হাকিম সাহেব এক পর্যায়ে বলছিলেন, যে, ইস্কুল খোলার অনেক হ্যাংগাম আছে, স্থানীয় কারো মত, যে, ইস্কুল এখন খোলা না হোক। হাকিম সাহেবের কথায় এরকম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, ইস্কুল খোলার চেষ্টা নিয়ে হয়ত বিপদ ঘটতে পারে এবং বিপদটা প্রধানত তাহেরেরই। এ কথার তেমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি বক্তার কাছ থেকে, কিন্তু তাহের নিজের কাছে স্বীকার না করে পারে না যে, তার পেটের ভেতরে তখন গুরগুর করে উঠেছিল। তাহের নিজেকেই অতঃপর মনে মনে বিদ্রূপ করে এই বলে যে, এই জন্যেই কি তুমি কুতুবউদ্দিনের মাজারে যেতে চেয়েছিলে? হাত তুলে দোয়া করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন কোনো বিপদ না হয়? তাহের নিজেকে শাসন করে— না, মাজারে সে আর যাবে না, মাজারের কথা ভাববে না, স্থানীয় দ্রষ্টব্য হিসেবে পরে কখনো না হয় যাওয়া যাবে, কিন্তু ইস্কুলের কাজ ভালভাবে শুরু হবার আগে আর মাজারের ছায়া সে মাড়াবে না। অবিলম্বে ইস্কুলে যাবে, না, শহর দেখতে বেরুবে এই নিয়ে ক্ষণকালের দোটানায় পড়ে তাহের। অবশেষে, কৌতূহল প্রবল প্রমাণিত হয়; শহরের দিকে সে পা বাড়ায়। জলেশ্বরীতে আটত্রিশ বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল। এখানে থাকতেই তার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন এবং এখানেই করা সুপ্রচুর পাটের জমিতে মন দেন। তার বড় চার বোনের বিয়ে হয় এখানে থাকতেই এবং সে মধ্যম, একমাত্র পুত্র, তাকে ঢাকা পাঠান হয় পড়াশোনা করতে। দু'বছর আগে-পরে বাবা-মা দু'জনেরই মৃত্যু হয়। চার বোনের স্বামীরা এসে জমি বিক্রি করে দেয়। তাহের ঢাকায় থেকে যায়। তাহের নিজেই জলেশ্বরী ছাড়ে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর আর আসে নি। এখনো যাবার দিনটি মনে আছে। একটি শিমুল গাছে অসংখ্য ফুল ধরেছিল; চমৎকার রোদ উঠেছিল, তার মেজো বোনের স্বামীর সঙ্গে সে ঢাকাগামী ট্রেনে উঠেছিল; রণজিত ইস্টিশান পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল এবং বিদায়-উপহার হিসেবে নিজের অতিপ্রিয় একটা পকেট ছুরি, যা দিয়ে আমের সময়ে কাঁচা আম কেটে খেত সে, তাকে দিয়েছিল। তাহের চৌরাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একটা পথ গেছে, অন্তত তার কৈশোরকালে যেত, ইস্টিশানে, আরেকটা বাজারের দিকে, অন্যটা থানা পেরিয়ে ইস্কুলের দিকে, আর চতুর্থ পথটি খানিক বাদে শহর থেকে বেরিয়ে ডাকবাংলা পাশে রেখে নেমে গেছে ধান খেতের ভেতরে দূরান্তরে, গ্রামগুলোতে। তাহের বাজারের দিকে পা বাড়ায়। অবিলম্বে তাকে যেন দু'পাশে বড় টিনের ঘর চেপে ধরে, জানালাবিহীন ঘর, তেজারতি কারবারের জন্যে প্রতিটি ঘরের সামনে বারান্দা। তখন এত ঠাসাঠাসি ছিল না বাজারের এই পথটা। কোনো কোনো ঘরের মাথায় রঙচটা সাইনবোর্ড; অমুক মার্চেন্ট, অমুক বিপণি, অমুক স্টোর। পুরনো শুধু একটা দোকানই তার চোখে পড়ে— খেলার সাজসরঞ্জাম বিক্রি হতো; ছোটবেলায় কী প্রকাণ্ড মনে হতো দোকানটাকে, এখন যেমন মলিন, তেমনি সংকুচিত মনে হয় প্লেয়ার্স মার্টকে। দোকানের মালিক ছিল খুব সৌখিন, তেল-মসৃণ কালো চিকন; নামটা মনে পড়ে না। এখন এই যিনি বাইরে দাঁড়িয়ে, মাথায় বিরল শাদা চুল নিয়ে সাবধানে দাঁতন করছেন, হয়ত তিনিই সেই লোক। তাহেরের চোখে চোখ পড়ে তার। লোকটি তাকে আধাসন্ধিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে থাকেন। তাহের মুহূর্তকাল ইতস্তত করে তার সামনে যায় এবং জিগ্যেস করে, তিনি এই দোকানের মালিক কি-না। লোকটি হ্যাঁ-সূচক মাথা দুলিয়ে, মুখ থেকে একরাশ দাঁতনের রস ফেলে জানায়, দোকান খুলতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি আছে, তার কি কিছু কেনবার প্রয়োজন আছে? ছেলেবেলায় একবার বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে সে এই দোকান থেকে একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল কিনেছিল, তারপর বাবা তাকে কানে ধরে এই দোকানে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাকে ও দোকানিকে একই হারে বকাবকি করে, ফুটবলটা ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা উদ্ধার করেছিলেন; সেই থেকে তাহের আর এ দোকানের সামনে দিয়ে কক্ষনো যেত না, নিতান্ত দরকার হলে রাস্তার অন্যপাড় দিয়ে সুট করে দৌড়ে পার হতো। লোকটির কি সে ঘটনা মনে আছে? নামটাও হঠাৎ মনে পড়ে যায়— ভদ্রমিয়া। তাহের ভদ্রমিয়াকে সাহায্য করে অতীতের দিকে তাকাতে। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে তার; আরে বাপরে বাপ, সাব-রেজিস্টার সাহেবের কথা এখনো মনে আছে তার। ভদ্রমিয়া বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাকে বসাবার জন্যে; বড় খুশি হয় তাকে দেখে। কোমরের গোছা থেকে চাবি নিয়ে অবিলম্বে দোকান খোলেন এবং চেয়ার টেনে তাকে বসতে দেন। এক পেয়ালা চা খেতেই হবে। কোনো নিষেধ না শুনে ভদ্রমিয়া তক্ষুণি দু'দোকান পরে চায়ের স্টলওয়ালাকে বিষম তাড়া দিয়ে এক কাপ চা করিয়ে নেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহেরের বাবার সুখ্যাতি করতে থাকেন। তারপর, হঠাৎ নিভে গিয়ে দুঃখ করতে থাকেন, দোকান মোটেই ভাল চলছে না গত কয়েক বছর ধরে। না খেলার সরঞ্জাম, না শিল্ড, না গ্রামোফনের রেকর্ড কিছুই বিক্রি হচ্ছে না, অন্য ব্যবসার চেষ্টা করেছিলেন, তাতেও প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। এখন উপায়? হাত উল্টে ভদ্রমিয়া বড় ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকেন। আরো জানান, মুক্তিযুদ্ধের ন'টি মাসে তাঁকে, এই শহরের অন্যান্য সকলের সঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে হয়, ফিরে এসে দোকানে একটা মাল পান নি, এমনকি, বাবার আমলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুরনো দেয়াল ঘড়িটা পর্যন্ত উধাও হয়েছে। এ-সবই বিহারিদের কাণ্ড, বলে ভদ্রমিয়া তাকে জিগ্যেস করেন, সে তো ঢাকা থেকে আসছে, বিহারিদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেয়া হচ্ছে কি ? আহ এরা যা করেছে, এই বলে ভদ্রমিয়া মুহূর্তে রক্তপিপাসু হয়ে যান, দাঁতন'টা সজোরে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এদের নির্বংশ করা উচিত, এবং ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন, এই বলে দিলাম দেখে নেবেন, বিহারি বাংলাদেশে থাকলে অচিরেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, দেশে শিয়াল-কুকুর ছাড়া মানুষ আর থাকবে না। ভদ্রমিয়া কাছে একটা চেয়ার টেনে বসেন, বলতে থাকেন এই শহর থেকে সকলের পালাবার ইতিহাস। মিলিটারি যে ঢাকায় নেমে পড়েছে তা তারা কয়েকদিন পর জানতে পারেন। স্থানীয় এম.পি. হাফেজ মোক্তার, তিনি কাউকে কোনো সংবাদ না দিয়ে নিজের ছেলেমেয়ে, ভাই-বেরাদর, টাকা-পয়সা নিয়ে একদিন উধাও হয়ে গেলেন, নিশ্চিন্তে বসে থাকলেন গিয়ে ভারতে, জলেশ্বরীর এতগুলো লোক, যাদের ভোটে তিনি পাশ করলেন, ভোটের আগে যাদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন, সেই মানুষগুলো চারদিকে এক ঝাঁক পাগলা কুকুরের মধ্যে তটস্থ হয়ে পড়ে রইল এখানে। তখন কে এসেছিল বাঁচাতে ? হাফেজ মোক্তার বা তার কোনো চেলাচামুণ্ডা নয়, এই শহরেরই কতগুলো বখাটে ছোকরা; যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চায়ের স্টলগুলো গরম করে রাখত আর একদিন দু'দিন বাদেই রংপুর যেত সিনেমা দেখতে, তারাই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে অভয় দিল, যে যার জায়গায় থাকুন, সময় হলে আমরা আপনাদের জানাব কী করতে হবে। তারপর, একদিন রাতদুপুরে পড়ল প্রত্যেক বাড়ির দরজায় ঘা। এক্ষুণি বাইরে আসুন, সেই ছেলেরা বলছে, রংপুর থেকে মিলিটারি রওনা হয়ে গেছে, ভোরের দিকেই এসে পড়বে, সঙ্গে একটার বেশি সুটকেশ নেবেন না, হাঁটতে হবে অনেকদূর। ভদ্রমিয়া বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, পথের মোড়ে বহু লোক, তারা সবাই ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ছেলেরা পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল রাতের অন্ধকারের ভেতরে; গোটা শহরটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল শহরের বাইরে, শহর ছাড়িয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, ধানক্ষেত ভেঙ্গে, একেবারে ব্রহ্মপুত্রের তীর বরাবার। সারারাত চলবার পর তারা মাত্র অর্ধেক পথ যেতে পারে; অনেকেরই চলবার মত শক্তি থাকে না। অনেকেই বলে, বিশেষ করে যাদের কোমরে জোর আছে, না, থামা চলবে না, থামলেই ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। ঠিক হয়, যারা হাঁটতে সক্ষম তারা এগিয়ে যাক, বাকি সবাই খানিক বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের দিকে আবার রওনা দেবে। ছেলেরা দু'দল হয়ে একদলকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আরেক দলকে দেখাশোনা করতে থাকে। কিন্তু এই পেছনে পড়ে থাকা দলটির আর এগোন হয় না। সকাল সাতটার দিকে দলে দলে জলেশ্বরীর বিহারিরা, যাদের তারা এতকাল পড়শি হিসেবে দেখে এসেছে, পাকিস্তান হবার পর তারা যখন কাটিহার হয়ে জলেশ্বরীতে আসে তখন যাদের এই জলেশ্বরীর মানুষেরা আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, সেই বিহারিরা বন্দুক-সড়কি-ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে তাদের ঘেরাও করবার জন্যে। পলাতক মানুষদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, তবে, ছেলেরা যে কিছু বন্দুক যোগাড় করেছিল, তা কারো জানা ছিল না। ছেলেরা সেই বন্দুক দিয়ে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই তাদের পরাজয় হয়, বেশ কয়েকটি ছেলে প্রাণ দেয় সে খণ্ডযুদ্ধে। বাদবাকি সবাইকে ওরা ধরে নিয়ে যায় এবং লোকদের আবার হাঁটিয়ে ফেরত নিয়ে যায় জলেশ্বরীতে। ভদ্রমিয়ার ভাগ্য ভাল, সে এই দ্বিতীয় দলে থাকলেও বিহারিদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই গা ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়েছিলেন কাছের এক জঙ্গলে। সেখান থেকেই দেখেছেন ঐ লড়াই; দেখেছেন বিহারিদের প্রত্যেকের গলায় জরির মালা আর হাতে অস্ত্র। ভদ্রমিয়া প্রশ্ন করেন, এই বিহারিদের নিশ্চিহ্ন করাটাই কি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কর্তব্য নয়? তাহের যাক বাজারে, দেখতে পাবে বড় বড় গুদাম পুড়ে এখনো ছাই হয়ে আছে। বাজারে তো তারা আগুন দিয়েছেই, সে আগুনে তারা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছে ব্যাপারিদের ছোট-ছোট বাচ্চাদের, জীবন্ত সব বাচ্চা বুকফাটা চিৎকার করতে করতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাজারের ঐ আগুনের মধ্যে। তাহের ভদ্রমিয়াকে জিজ্ঞেস করে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন? জলেশ্বরীতে? বাধা পেয়ে ভদ্রমিয়া কিছুক্ষণ হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থাকেন, তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠেন যে, তিনি তখন ভারতে থাকলেও যারা এখানে ছিল তারাই পরবর্তীকালে এই মর্মন্তুদ কাহিনী সবাইকে বলেছে। ভদ্রমিয়া শেষবাক্য উচ্চারণের অটলতা নিয়ে জ্ঞাপন করেন যে, জলেশ্বরী এখন এক ভয়াবহ গোরস্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। নৌকো সম্পূর্ণ ডুবে যাবার পর, বিলের বুকে আবার যে নিস্তরঙ্গতা ফিরে আসে, অবিকল তারই অনুরূপ একটা পরিবেশের ভেতর ভদ্রমিয়া নিষ্ফল দাঁড়িয়ে থাকেন। 'আবার দেখা হবে'— বলে তাহের পথে নামে। কিন্তু ভদ্রমিয়া তাকে রেহাই দেন না। তাহেরের জামার আস্তিন ধরে আবারো জানতে চান সত্যিই সে ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছে কি-না? সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ভদ্রমিয়া ফিসফিস করে জানায়, এতকাল ইস্কুলের যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম তিনিই সরবরাহ করে এসেছেন, বছর তিনেক যাবৎ জনৈক বিহারি ব্যবসাটা হাতিয়ে নেয়; এখন যদিও বিহারিদের আর কোনো অস্তিত্ব জলেশ্বরীতে নেই, তবু ভদ্রমিয়ার আশংকা অন্য কোনো ব্যক্তি তার বদলে ইস্কুলে সরবরাহ করতে শুরু করবে, হয়ত এম.পি. হাফেজ মোক্তারের কোনো আত্মীয় কিংবা চেলা। তাহের কি এই অন্যায় প্রতিরোধ করতে পারবে না? ভদ্রমিয়া তাকে আশ্বাস দেন যে, অন্যের চেয়ে সুলভেই তিনি মাল সরবরাহ করবেন। আরো এক পেয়ালা চা? তাহের এগিয়ে যায়। একেবারে শেষ মাথায় বাজার। তারপরেই রাস্তাটা কাঁচা এবং সরু হয়ে গ্রামের দিকে নেমে গেছে। বাজার বসতো সকাল আর সন্ধেবেলায়। এখনো হয়ত তাই। বাজারের ভেতরে ঢোকে তাহের, আলু পটলের কিছু দোকান ইতিমধ্যেই খুলে গেছে। মাছের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা, এখন বিপণি শূন্য, কিন্তু আঁশটে গন্ধ ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে আজো। গোয়ালন্দ থেকে রেলে করে বরফ-ঢাকা ইলিশের চালান এলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, মনে পড়ে তাহেরের। একবার বিরাট এক গজার মাছ উঠেছিল; মাছটা যে গরুর গাড়ি করে আনতে হয়েছিল বাজারে, আর কাটতে হয়েছিল কুড়াল দিয়ে। রক্তাক্ত কুড়ালের ছবিটা এখনো তার স্পষ্ট মনে আছে। অর্থাৎ, এতকাল মনের ভেতরেই ছিল, কখনো মনে পড়ে নি, কিন্তু আজ এই জলেশ্বরী বাজারের মেছোপাড়ায় এসে দাঁড়াতেই চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল সে কুড়াল। তাহের তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে; দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে বাজার থেকে। হাঁটতে থাকে উল্টো দিকে, আবার সেই একমাত্র চৌরাস্তার দিকে। একটা রিকশা এসে পেছনে থামে তার। সে কি কোথাও যেতে চায়? অবাক হয় তাহের, তার ছোটবেলায় এখানে রিকশা ছিল না, চরণই ছিল একমাত্র ভরসা। না, সে হেঁটেই যাবে। রিকশাওয়ালা তাকে ছাড়ে না। তার বক্তব্য, গাড়ি থাকতে কষ্ট করবেন কেন মিয়া? রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে তাহেরের মনে হয়, লোকটি এখনো তার পেশায় অভ্যস্ত হয় নি, এখনো তার গায়ে ফসলক্ষেতের ঘ্রাণ, এখনো তার মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো এক ভূমিহীন কিষাণের প্রতিচ্ছবি। এমনকি সে যে রিকশা চালাচ্ছে, মনে হয়, ছিপ নৌকো বেয়ে খাল পার করছে। তাহের তার রিকশায় উঠে বসে পায়ের পরিশ্রম বাঁচাতে নয়, লোকটির সঙ্গে গল্প করতে। লোকটি সখেদে জানায়, চাষাবাস কোথায় মিয়া? এই রিকশা সে ভাড়া নিয়েছে মহাজনের কাছ থেকে, তাকে দিতে হবে চার টাকা, তারপর যা বাঁচে তার, এর মধ্যে আবার রিকশা মেরামতির খরচ তারই ঘাড়ে; দিনান্তে যদি গোটা তিনেক টাকা পায় তো সেদিন তার রোজগার ভাল হয়েছে বিবেচনা করতে হবে। লোকটি হঠাৎ জানায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তার স্ত্রী মারা যায়। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তাহেরের কণ্ঠনালিতে এক টুকরো পাথর এসে স্থির হয়ে যায়। কোনোরকমে সে শুধু এটুকুই প্রশ্ন করতে পারে, যে, কী হয়েছিল? রিকশাওয়ালা অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দেয় না। নৌকোর লগি ঠেলবার ভঙ্গিতে সে রিকশা বেয়ে চলে। অনতিপরে আবার সেই মধ্যরাতে শহর ছেড়ে পালাবার কাহিনী শোনা যায়। শহরের বাইরেই সে গ্রামে থাকত; পথের ওপর শত শত পায়ের শব্দ পেয়ে সে জেগে ওঠে; যখন শোনে যে মিলিটারির ভয়ে জলেশ্বরী থেকে বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ভারত যাবে বলে তখন তার আশংকা হয়, পেছনে পড়ে থাকলে তাকে হয়ত মিলিটারি এসে মেরে ফেলবে। অতএব সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে স্ত্রী এবং তিন শিশুকে নিয়ে। এক শিশুর ছিল জ্বর এবং উদারময়, পথে তার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পেরেছিল, তবে নদী পার হওয়া সম্ভব হয় নাই; কারণ, বাকি দুই শিশুও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় সে জনৈক গ্রামবাসীর বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়। তারা বিনা পয়সায় তাকে আশ্রয় দেয় নি, তার সঙ্গে যাবতীয় যা ছিল, সবই তুলে দিতে হয় এবং এরকম প্রতিশ্রুতিও দিতে হয় যে, গোলমাল মিটে গেলে, সে আতিথ্যের অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করবে আগামী ফসল থেকে। বস্তুত, সেই আতিথ্যের অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতেই তাকে সাব-রেজিস্ট্রি আপিসে গিয়ে লিখে দিতে হয়েছে তার একমাত্র সম্বল, সাড়ে তিনবিঘা জমি। সে না দিলেও পারত, তবু দিয়েছে, কারণ, কথা খেলাপ সে জীবনে করে নাই, দ্বিতীয় কারণ, তার স্ত্রীকেই যখন সে হারিয়েছে ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সেই গৃহস্থ বাড়িতে, তখন জমি দিয়ে আর করবে কী সে? স্বাধীনতার পরে অনেকে তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন ভাইয়ের কাছে নালিশ করতে, তাও সে করে নাই। রিকশাওয়ালা হঠাৎ একটা সারমর্ম উপস্থিত করে— সকলেই আছে নিজের তালে। তাহের তাকে কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তার স্ত্রীর মৃত্যু হলো কী করে, শুনতে। অবিলম্বে লোকটি আবার কাহিনীর খেই ধরে ফেলে। সে বলে, ব্রহ্মপুত্র তীরের সেই বাড়িতে থাকাকালীনই মিলিটারি এসে গ্রামে হাজির হয়; তারা জানতে চায় কতজন নদী পার হয়েছে, এ গ্রামে কারা কারা তাদের সাহায্য করেছে ভারতে চলে যেতে। গ্রামটি সীমান্তে অবস্থিত বলে মিলিটারি এখানে পাকাপাকি থানা গড়ে বসে; গ্রামের চারদিকে তারা তাঁবু গড়ে এবং অচিরেই নানা অদ্ভুত আকৃতির কামান-বন্দুক এনে হাজির করে তারা। সে বুঝতে পারে, এদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে ভারতের দিকে আর বেরুতে পারবে না; একমাত্র এক দিকেই সে রওনা হতে পারে, আর তা হলো জলেশ্বরীর দিকে। সে মনস্থির করে জলেশ্বরীতেই সে ফিরে যাবে; বিশেষ, মিলিটারি যখন অভয় দিয়েছে যে জলেশ্বরীতে আর কোনো ভয় নাই, বস্তুতপক্ষে, জীবন সেখানে শুধু স্বাভাবিক নয় আগের চেয়ে বরং তেজি চলছে। তারও জমিতে ফসল কাটাবার সময় হয়ে এসেছে, অতএব সে জলেশ্বরীতে ফিরে যাওয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাব্যস্ত করে। কিন্তু একথা জানাতেই গৃহস্থের মেজো ছেলে বলে ওঠে যে, তাদের যাওয়া হতে পারে না। সে এতটা জোর দিয়ে কথা বলে যে, দ্বিতীয় বার ইচ্ছাজ্ঞাপন করা যায় না। তার এ বাধা দেবার কারণও স্পষ্ট বোঝা যায় না। রাতে যখন তারা শুয়ে আছে, তখন একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনা তার মনের ভেতর উঁকি দেয়, এবং কথাটা স্ত্রীকে জানাতেই সে বলে ওঠে, তুমি পাগল হয়েছ ? তবু সন্দেহ যখন একবার উদিত হয় তখন তা সরিয়ে ফেলা দুষ্কর। তার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হতে থাকে যে, এ বাড়ির মেজো ছেলে তার স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট। পরদিন সে প্রতিটি হাবেভাবে এ সন্দেহের পক্ষে সমর্থন পেতে থাকে। রিকশাওয়ালা এ কথাও জানায় যে, বাড়ির মেজো ছেলে ছিল মিলিটারির গোপন হরকরা। পরদিন মিলিটারি বাড়িতে এসে চড়াও হয়, এবং লোকটির কথায়, সম্পূর্ণ বানান তল্লাশি চালিয়ে তার স্ত্রীকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আর সে ফেরত আসে নাই। মেজো ছেলে সর্বক্ষণ তাকে আশ্বাস দিয়ে যেত যে, সে তার স্ত্রীকে মিলিটারির হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে ধারণা করে নি যে, সে সত্য কথা বলেছে। একবার সে গ্রাম থেকে বেরুবার চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নাই। তারপর, যুদ্ধের শেষ দিনে, যখন গ্রাম থেকে মিলিটারি পালিয়ে যায়, তখন সে তাদের আস্তানায় গিয়েছিল। আস্তানাটি ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল আপিসে। সেখানে পেছনের এক গোয়ালঘরে আবিষ্কার করা যায় এগারটি রমণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ, তার মধ্যে একজন হচ্ছে তার স্ত্রী, বাকি সবাই সে গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের নিরুদ্দিষ্ট বধূ ও কন্যা। দুই শিশুকে নিয়ে সে জলেশ্বরীতে ফিরে আসে। নির্লিপ্ত স্বরে সে জানায় যে, ঐ গৃহস্তের মেজো ছেলেসাক্ষাৎ পেলে সে তাকে হত্যা করবে; বস্তুতপক্ষে তার জীবিত থাকবার বর্তমান একমাত্র উদ্দেশ্য এই হত্যা সংঘটিত করা। তাহের জানতে চায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি আছে কোথায় ? তার কোনো সন্ধান নাই। অবিলম্বে তারা ইস্কুলের কাছে এসে পৌঁছায়। রিকশাওয়ালা বলে, তার বড় ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে, তাকে সে ইস্কুলে দিতে চায়, যেন সে লেখাপড়া করে জলেশ্বরীর মত নরক থেকে বেরিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারে। তার এ ইচ্ছার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় তাহের। তার যতদূর জানা, এই জলেশ্বরীর মানুষেরা এতটাই মাটিকে ভালবাসে যে, তিরিশ মাইল দূরে জেলা সদর যেতেও তারা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চূড়ান্ত বিদায় নিয়ে রওনা হয়; অন্তত তার ছেলেবেলাতে এই রকমটাই সে ধারণা পেয়েছিল। আর এই রিকশাওয়ালা প্রার্থনা করেছে, তার পুত্র বড় হয়ে যেন জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যায়। লোকটির এই নির্দয় তিক্ততার সম্মুখে তাহের অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করতে পারে; বলতে গেলে বহুদিন পরে এ ধরনের অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এমনকি তার স্ত্রীর আত্মহত্যার পরেও সে ক্রোধ অনুভব করে নাই, বস্তুত কোনো কিছুই অনুভব করে নাই, যদিও বা করে থাকে, তা ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, হতাশা নয়, হয়ত শুধু একপ্রকার অনিবার্যতাই সে অনুভব করেছিল। রিকশাওয়ালা জানায়, সে তার ছেলেকে নিয়ে অচিরেই একদিন ইস্কুলে আসবে। তাহের তাকে এই জরুরি সংবাদটি দেয়া এই মুহূর্তে অনাবশ্যক মনে করে যে, এই ইস্কুল বড় ছেলেদের জন্য, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে। তাহের তাকিয়ে দেখে, ইস্কুলটি বিগত পঁচিশ বছরে কিছুমাত্র বদলায় নাই। লাল ইটের দালান; বিশুষ্ক রক্তের মতই। রঙটা এখনো ইস্কুলের সারাদেহে লেপে রয়েছে। তবে, সমুখে মাঠে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তনটি নিম্নমুখী, মাঠের অধিকাংশই এখন আগাছায় পূর্ণ এবং পথচারীর পদতাড়নায় অসংখ্যস্থলে ঘাসলুপ্ত। অথচ, এই মাঠ একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছিল সবুজ চাদরের মত, পরিচ্ছন্ন, টান-টান; দু'দিকে ছিল গোলপোস্ট, ছেলেরা রোজ বিকেলে ফুটবল খেলত, একদিকে ছিল শারীরিক কসরত করবার যুগল দণ্ড, শাদা রঙ ছিল তার। এখন সেই দণ্ড যুগল উধাও হয়েছে; গোলপোস্ট মাথায় দণ্ড দুটিও নিরুদ্দেশ; সেখানে বাঁশ বেঁধে দেয়া হয়েছে; আর এতেই বোঝা যায় যে, এখনো এ মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে থাকে। লাল দালানের পাশে ছোট একটা ঘর; ছেলেবেলায় দেখেছিল এই ঘরটির টিনের চালে ছিল লাল টকটকে রঙ, আর দেয়াল ছিল ধবধবে শাদা। এটি ছিল ইস্কুলের আপিস; ছিল তিনটি কামরা, একটি হেড মাস্টারের, মাঝের আপিস, শেষ কামরায় অন্য মাস্টাররা বসতেন। তাহেরের মনে আছে, এই ইস্কুলে সে মাত্র কয়েকমাসের জন্যে পড়েছিল, তারপরেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ঢাকায়। ইস্কুলের দপ্তরি ছিল, নামটা এখনো মনে আছে, অযোধ্যা, বিহার থেকে এসেছিল, দীর্ঘকাল জলেশ্বরীতে থেকে চমৎকার স্থানীয় কথা বলতে পারত সে, রাতে সুর করে রামায়ণ পড়ত, বিকেলবেলায় ইস্কুল ছুটির সময় দেখা যেত যে পেতলের থালায় সে লংকা দিয়ে ছাতু ডলছে। অযোধ্যা কি এখন আছে ? ইস্কুলের দপ্তরির জন্যে পেছনে একটা শনে ছাওয়া ঘর নির্দিষ্ট ছিল। তাহের এখন সেদিকে এগোয়। ঘরটি আগের জায়গাতেই আছে, তবে, মাথায় এখন তার শনের বদলে টিন। তাহের ভাবে, অযোধ্যা বলে সে ডাক দেবে কি-না ? ডাক দিতে হয় না; এক রমণী বাইরে আসছিল, তাকে দেখেই ত্রস্তে মাথায় কাপড় টেনে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যায় ভেতরে, সুপুরির ডোঙা দিয়ে বানানো বেড়ার ওপারে। তাহের কাউকে ডাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। অবিলম্বে একটি লোক বাড়ির ভেতর থেকে আসে; পরনে তার লুঙ্গি, উর্ধাঙ্গ নগ্ন, হাতে দা, ঘরে কোনো কাজ করছিল সে, তাকে আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করে, তিনিই কি নতুন হেডমাস্টার ? পরিচয় পেয়ে সে জানায় যে, তার নাম পরাণ এবং সে এই ইস্কুলের দপ্তরি। তাহের তাকে প্রশ্ন করবার লোভ সামলাতে পারে না, অযোধ্যা কোথায় ? পরাণ কপাল কুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করে, তারপর জানায় যে, অযোধ্যা বলে কাউকে সে চেনে না। সে আজ দশ বছর ধরে এই ইস্কুলে দপ্তরি পদে আছে, জলেশ্বরীতে তার জন্ম, অযোধ্যা বলে কোনো ব্যক্তির নাম সে কখনো শোনে নাই। সে বরং কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, অযোধ্যা কে ? তাহের সে প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো উৎসাহবোধ করে না; একটি মানুষ এভাবে অপসৃত হবার এক প্রকার বেদনা তাকে ক্ষণকালের জন্যে বিচলিত করে। অনাবশ্যকভাবে সজোরে মাথা নেড়ে তাহের সে চাঞ্চল্য মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে, তারপর, পরাণকে বলে ইস্কুল খুলে দিতে। হেডমাস্টারের ঘরের বারান্দায় অলসভাবে শুয়ে আছে একটি গাই, চতুর্দিকে আজ সকালে এবং বিগত কয়েকদিনের গোবর ছড়ানো; দেখে আরো বোঝা যায়, শুধু গাই নয়, একাধিক ছাগলও এই বারান্দায় নিয়মিত বিচরণ করে থাকে, কিংবা শুয়ে শুয়ে পশু জীবনের আকাশ-পাতাল ভাবনা করে। পরাণ অত্যন্ত বিগলিত স্বরে বিনাকুণ্ঠায় নিবেদন করে যে, গাইটি তারই, তবে নিতান্তই পশু বলে স্থান-বিবেচনা-রহিত; তাছাড়া দীর্ঘকাল ইস্কুল বন্ধ বলে, এ-যাবৎ বারান্দা পরিষ্কার রাখবার আবশ্যকতাও দেখা দেয় নি। বস্তুতপক্ষে, ইস্কুল এত তাড়াতাড়ি খুলবে না বলেই তার ব্যক্তিগত ধারণা। তাহের কারণ জানতে চায়। উত্তর হয়, ছাত্র কোথায় ? তাছাড়া, দেশের এই অবস্থা, ইস্কুলের চেয়েও জরুরি অনেককিছু পড়ে রয়েছে যেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রথম কর্তব্য। যথা ? পরাণ হাতের গামছা দিয়ে হেডমাস্টারের জন্যে নির্দিষ্ট টেবিল ও চেয়ার থেকে ধুলোর পুরু পরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিদায় করবার কাজে নিয়োজিত থাকে; অবিলম্বে কোনো উত্তর দেয় না। পরে, সংক্ষেপে শুধু জানায়, ইস্কুল নিয়ে বহু গোলমাল চলছে, এর আগেও বার দুয়েক ইস্কুল খুলবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয় নাই। পরাণ ভ্রু কুঞ্চিত করে টেবিল ও চেয়ারের দিকে দেখে, তার ধারণায় যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে বলে সে মনে করে, তার ভ্রু আবার মসৃণ হয়ে যায়, স্মিতমুখে সে তখন তাহেরকে নিঃশব্দে আসন নেবার আমন্ত্রণ জানায় এবং এবার সে আলমারির দিকে ধাবিত হয় সেটি পরিষ্কার করবার জন্যে। তাহের তাকে বোঝায় যে আলমারি পরিষ্কার করবার চেয়েও আশু প্রয়োজন, সমস্ত ইস্কুলটা পরিষ্কার করা; সোমবার ইস্কুল খুলবে। হেডমাস্টার হিসেবে তাহের প্রথম নির্দেশটি দেয়— সমস্ত ইস্কুল প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় যেন গোবর না থাকে। এবং সে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, ইস্কুলের মাঠের ঘাস অন্তর্হিত হবার পেছনে পরাণের গাভীটির এক অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। তাহের বলে দেয়, অতঃপর গাভীটি যেন পরাণের বাসার চৌহিদ্দিতেই থাকে। এর জবাবে পরাণ নিবেদন করে, আজকাল মানুষই শাসনে থাকে না, একটি পশু থাকবে কী প্রকারে! সেই সঙ্গে সে যোগ করে, তার গাভীর দুধ অত্যন্ত মিষ্টি এবং তাহের যদি সম্মত হয় তাহলে সুলভে তাকে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খাঁটি দুধ এক বাটি করে রোজ বিকেলে দিতে পারে। তাহের তার কাছ থেকে আলমারির চাবি চেয়ে নেয় এবং অবিলম্বে তাকে লোকের সন্ধানে বেরুতে বলে; ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ইস্কুল পরিষ্কারের কাজ শুরু হওয়া চাই। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা সে খাতাপত্র দেখে কাটায়। বিশেষ কিছু জানা যায় না; খাতার বেশিরভাগই অনুপস্থিত; এমনকি মোট ছাত্র সংখ্যা কী, তাও ধারণা করা যায় না। হতাশ হয়ে সে মাথায় দু'হাত চেপে চোখ বুজে বসে থাকে। পরাণ এসে জানায়, লোক দু'জন পাওয়া গেছে বটে, তবে তারা কিঞ্চিৎ বেশি পয়সা দাবি করছে। এখন কর্তব্য কী ? বস্তুতপক্ষে লোক দু'জন বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাহের কি তাদের সঙ্গে নিজে কথা বলে দেখতে চায় ? অবিলম্বে দুই ব্যক্তি এসে ঘরের ভেতরে দাঁড়ায় এবং বিনাবাক্যে বিনা সম্ভাষণে তারা কানখাড়া করে মাটির দিকে চোখ রেখে সংকট-কঠিন চেহারা উপস্থিত করে রাখে। তারা সোমবার সকালের ভেতরই সমস্ত ইস্কুলবাড়ি পরিষ্কার করতে রাজি আছে, বিনিময়ে একেকজন বারো টাকা করে দাবি করে। তাহের দশ টাকায় রাজি করায় এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দাও। লোক দুটি নড়ে না, পরাণের দিকে তারা সপ্রশ্ন চোখে তাকায়। পরাণ নিবেদন করে যে, তারা কিছু আগাম চায়, আগাম পেলে বাড়িতে বাজার করে দিয়ে এসে এবং নিজেরা কিছু জলপান খেয়েই কাজে লেগে যাবে। আপিস ঘরের ভেতরে একটা ছোট সিন্দুক চোখে পড়েছিল তাহেরের, সেটি নিশ্চয়ই ইস্কুলের বেতন ইত্যাদি জমা রাখবার জন্যে এবং প্রয়োজনীয় খরচ মেটাবার জন্যে। তাহের পরাণের কাছে চাবি কোথায় জানতে চায়। পরাণ জানায়, ও সিন্দুক খোলাই আছে এবং ওতে কোনো পয়সা নেই। এ ইস্কুলবাড়িতে যখন মিলিটারিদের আস্তানা বসে তখন সিন্দুকটির ভেতরে যাবতীয় যা উধাও হয়ে যায়। পরাণ আরো জানায় যে, ইস্কুলের সমস্ত খরচ প্রথমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি হাকিম-সাহেবের কাছ থেকে, তারপর তার দস্তখতওয়ালা চিরকুট স্থানীয় এম.পি. অর্থাৎ হাফেজ মোক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাতে দস্তখত করেন, আর তখন সেই চিরকুট দেখে ইস্কুলের কোষাধ্যক্ষ পয়সা দিয়ে থাকেন। এই জটিল পন্থাটি বর্ণনা করে পরাণ অত্যন্ত সন্তোষবোধ করে এবং উজ্জ্বল চোখে তাহেরকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহের কোনো সমস্যা দেখতে পায় না। হাকিম সাহেবের সঙ্গে আজ সকালেই তার যে কথা হয়েছে, তাতে এই ধারণাই সে পেয়েছে যে, ইস্কুল পরিচালনায় তাহেরের সিদ্ধান্ত ও মতামতই তিনি সর্বোপরি জ্ঞান করবেন। তাহের আপাতত নিজের পকেট থেকে চার টাকা বের করে দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ করে দেয় এবং অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিতে বলে। আবার সে ইস্কুলের খাতাপত্রে মনোযোগ দেয়। হঠাৎ তার চিন্তা অন্যদিকে ধাবিত হয় এবং খাতা থেকে চোখ তুলে আপিস ঘরটা ভাল করে তাকিয়ে দেখে। বেশ প্রশস্ত ঘর, এক পাশে আরাম করবার জন্যে পাতা রয়েছে বিশাল এক ইজি চেয়ার— তার বেতের ছাউনি বহু জায়গাতেই এখন ছিন্ন, মাথার কাছে কাঠের ফালিতে বহুদিনের তেল এবং ঘাম একপ্রকার আঠালো কালিমা লেপন করে দিয়েছে। তাহেরের মনে হয়, এই ইজি চেয়ারটির কোনো আবশ্যকতা নেই, এটিকে দূর করে দিলে, এখানেই সে বিছানা করে নিতে পারে। এবং তার থাকার জায়গার সুরাহা হয়ে যায়। অবিলম্বে সে বাইরে আসে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করে। কিন্তু পরাণ বা জন মজুর দু'জন, কারুরই সাক্ষাৎ সে পায় না। গলা তুলে সে পরাণকে ডাকে। তবে সাড়া পায় না, একবার ভাবে, পরাণের বাসায় সে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পরাণের স্ত্রী মাথায় বিরাট ঘোমটা টেনে উপস্থিত হয় এবং জানায় যে, পরাণ বাজারে গেছে, দুধ বিক্রি করতে, ফিরতে ফিরতে দুপুর পার হয়ে যাবে। জন মজুর দুটি কোথায় ? পরাণের স্ত্রীর সে কথা জানবার কোনো কারণ নেই, তবু ঈষৎ রুষ্ট তাহের তাকেই প্রশ্নটা না করে পারে না। রমণীটি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ত্রস্ত পায়ে বিদায় হয়। ইস্কুলের অপরিচ্ছন্ন বারান্দায়, ধারে-কাছে জনমানবের চিহ্নহীন বিশাল শূন্যতার মধ্যে তাহের হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর ক্রোধটা শাসন করে, প্রায় অবসন্নচিত্তে সে এসে আপিস ঘরে ঢোকে এবং ঐ ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। অচিরে তার ঘুম আসে; রাতে ভাল ঘুম হয় নাই; নানা প্রকার আকস্মিক এবং বিক্ষুব্ধ স্বপ্নের ভেতর দিয়ে রাতটা গেছে; এখন সে চেষ্টা করেও আর জাগ্রত থাকতে পারে না, ভারি পায়ে মন্থর গতিতে টেনে টেনে সে ঘুমের ঘোর রাজত্বের দিকে চলে যায়। সে যেন ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিল, প্রায় এ রকম মনে হয় সে তার শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে, গন্তব্যে পৌঁছুনোর পর তার স্ত্রী, যার মুখ মোটেও দেখা যাচ্ছে না যদিও চতুর্দিক এখন বিকেলের প্রীতিপদ আলো তার হাত ধরে টানছে। তাহের প্রথমে তার জামার আস্তিনে মৃদু একটা আকর্ষণ অনুভব করে এবং তৎক্ষণাৎ তা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আরো নিবিড় হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা নেয়। কিন্তু আস্তিনের খুঁট ধরে আকর্ষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। স্মিতমুখে তাহের তখন চোখ মেলে তাকায় এবং মুহূর্তে বাস্তব পারিপার্শ্বের ভেতরে নিজেকে সে আবিষ্কার করে। সে দেখে সাদাকালো ছিট দেয়া একটি বাচ্চা ছাগল তার জামার আস্তিন চিবচ্ছে। লাফ দিয়ে উঠে বসে তাহের। তাকিয়ে দেখে, দূরে চৌকাঠের ওপর ছাগলের মা কাত হয়ে শুয়ে চর্বিত চর্বণ করে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকায়, বিকেল তিনটে দশ। অন্তত তিন ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে ছিল। সময়টা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হয় তার। বাইরে বেরিয়ে দেখে, ইস্কুল যাদের পরিষ্কার করার কথা, সেই জন মজুর দু'জনের চিহ্নমাত্র নেই; অন্যত্র দূরে থাকে, তার আপিস ঘরের বারান্দা সেই আগের মতই গোবরে ঢাকা, অতএব, তারা এ পর্যন্ত কাজে মোটেই হাত লাগায় নি। আবার সেই ক্রোধ ফিরে আসে তাহেরের মাথার ভেতরে এবং তার মুখাপেক্ষী না থেকেই ক্রোধটা আয়তন বিস্তার করতে থাকে। পরাণেরও দেখা পাওয়া যায় না। তার বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গিয়ে দ্বিতীয় বার ডেকে তার স্ত্রীকে অপ্রস্তুত করা, এবং ততধিক নিজে অপ্রস্তুত হবার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না তাহের। অবিলম্বে সে আপিস ঘরে চাবি দিয়ে বেরোয়। প্রচণ্ড ক্ষুধা সত্ত্বেও তার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না; আসলে, এক প্রকার চিত্তের একমুখিতা তাকে পেয়ে বসে। সে জলেশ্বরীর সদর রাস্তায় যায়, তার ছেলেবেলায় সড়কটির কোনো নাম ছিল না, বস্তুত সড়কটিকে কীভাবে তারা কথায় নির্দিষ্ট করত তাও তার মনে পড়ে না। এখন দেখা যায় সড়কটির শুরুতেই কাঠের ফলকে সদ্য দেয়া নাম উৎকীর্ণ করা রয়েছে বঙ্গবন্ধু সড়ক। দু'পাশে ওষুধ, কাপড়, জুতো, ট্রাক, বাসন কোসনের দোকান, চায়ের স্টল সেখানে বিকেলি চায়ের আসর ইতোমধ্যেই বসে গেছে। তাহের দ্রুত এক গেলাশ চা পান করে নেয়। স্টলের কেউ কেউ কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকায়; এমনকি অনুচ্চস্বরে এও তারা বলাবলি করে যে, সে, তাহের ব্যাংকের নতুন ম্যানেজার হিসেবে জলেশ্বরীতে এসেছে। ভুল সংশোধনের কোনো আবশ্যকতা সে দেখে না; তবে নিজেকে ব্যাংক ম্যানেজারের মত দেখাচ্ছে, এই আবিষ্কারটি তার মনোগত ক্রোধটিকে কিছুটা প্রশমিত করতে সাহায্য করে। তাহের স্টল থেকে বেরিয়ে শোবার জন্যে বিছানা-বালিশ কেনে এবং রিকশা নিয়ে গতরাতের সেই ভাত খাবার হোটেলে যায়, সেখান থেকে নিজের সুটকেসটি সংগ্রহ করে। রাতের শয্যা-ব্যবহারের জন্য সে পয়সা দিতে চায়, কিন্তু দোকানি সবিনয়ে এবং কিছু পরিমাণে সভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। দোকানি জানায় যে, ক্যাপ্টেন ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই, হলে অবশ্যই সে জানিয়ে দেবে যে, তাহের তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। ইস্কুলবাড়িতে ফিরে এসে তাহের পরাণকে দেখতে পায় নিজের শিশুপুত্রকে গাভীর পিঠে চড়িয়ে তাকে আনন্দদানের চেষ্টা করছে। অবিলম্বে তাহের তার কাছে একাধিক বিষয়ে ব্যাখ্যা চায়। পরাণ শিশুপুত্রটিকে বাসার পথে ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে নিবেদন করে, যে, জন মজুর দু'জন ইস্কুল পরিষ্কার করবার কাজ নিয়েছে দিন হিসেবে নয়, চুক্তি হিসেবে; অতএব, তারা কেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে নাই, সে প্রশ্ন অযৌক্তিক; সোমবার সকালের মধ্যে যদি তাহের ক্রুদ্ধ হয় তাহলে সেটা সঙ্গত বলে সকল পক্ষই স্বীকার করবে। দ্বিতীয়ত, পরাণ নিজে কেন অনুপস্থিত ছিল ? তার উত্তর, ইস্কুল এখন বন্ধ, অতএব, আইনত সে ইস্কুলে হাজির থাকতে বাধ্য নয়, তাছাড়া, তাহের তাকে বলে নি যে পরাণকে এক্ষুণি দরকার হতে পারে, আর সর্বশেষ কারণ, সে যদি দুধ বিক্রি করতে বাজারে না যায় তাহলে তার পরিবার চলবে কী করে ? ইস্কুল থেকে যে মাইনে সে পায় তা দিয়ে সংসার চালান কোনো ফেরেশতারও কর্ম নয়। পরাণ বরং জানতে চায়, তাহের কি গরিবের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও স্বীকার করবার মত উদার নয় ? তাহের বারান্দায় গোবর সাবধানে এড়িয়ে আপিস ঘরে ঢোকে। পরাণের কথাগুলোতে সে ঈষৎ লজ্জিত বোধ করে এবং অকাট্য যুক্তি দেখতে পায়। তবু মনের এক কোণে খানিকটা অসন্তোষ তখনো দানা বেঁধে থাকে, তাই সে নীরবে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে দেয়ালে বহু বছর আগে তোলা ইস্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর বিবর্ণ ফটোগ্রাফগুলো নিস্পৃহ চোখে দেখতে থাকে। হঠাৎ, একটি ছবিতে মনে হয় অযোধ্যা রয়েছে। সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়। একেবারে পেছনের সারিতে অযোধ্যা সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তার পাগড়ি বাঁধা, যদিও অযোধ্যাকে সে কবে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছে, মনে করতে পারে না। তাহের পরাণকে কাছে ডেকে আঙুল তুলে দেখায়, এই হচ্ছে অযোধ্যা, ইস্কুলের দপ্তরি ছিল সে এবং এর কথাই তাহের ভোরবেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জিগ্যেস করেছিল। পরাণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তথ্যটুকু আত্মসাৎ করে এবং পরমুহূর্তে তার চোখ কৌতূহলী হয়ে তাহেরের আনা বিছানাপত্রের দিকে ধাবিত হয়। তাহের তাকে সংক্ষেপে জানায়, যে, সে এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে চায়, সে একা, অতএব, কোনো অসুবিধেই তার হবে না। আহারাদি ? পরাণ কি তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে না ? যদি তাহের তাকে মাসিক কিছু অর্থ দেয় ? কিন্তু তাহেরের যখন পরিবার আসবে ? তার উত্তরে তাহের জানায়, সে মৃতদার এবং সন্তানহীন। মুহূর্তে পরাণ চঞ্চল এবং তৎপর হয়ে ওঠে। হয়ত তাহেরের ব্যক্তিগত এই সংবাদ তার মনে কোনো প্রকার গূঢ় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকবে। অবিলম্বে সে আপিস ঘরটি পরিষ্কার করে ফেলে, স্ত্রীকে ডেকে বারান্দার গোবর ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে লাগায়, এবং নিজে তিনটি বসবার বেঞ্চ ইস্কুল ঘর থেকে এনে দড়ি দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে একটা চৌকি হিসেবে দাঁড় করায়, তার ওপর বিছানাটি পেতে দেয় মসৃণ করে। তারপর স্মিতমুখে নিবেদন করে, আজ রাত থেকেই কি তাহেরের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে ? তাহলে অবিলম্বেই তাকে বাজারে বেরুতে হয়। প্রবলভাবে তাহের মাথা নাড়ে। বস্তুতপক্ষে পরাণকে সে এখন আরো একবার অনুপস্থিত হতে দিতে চায় না; নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। সে জানায় আজ রাতে নিতান্ত ডালভাতই তার পক্ষে যথেষ্ট এবং যতটা না আগাম দেবার জন্যে, তার চেয়েও বেশি পরাণকে নিকটে রাখবার তাড়নায় সে পাঁচটি টাকা বের করে হাতে দেয় এবং বলে, পরে সে যেন হিসেব করে জানায় মাসে কত হলে তাকে দু'বেলা খাবার দিয়ে তার পোষাবে। পরাণ সম্ভবত স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দ্রুত বেরিয়ে যায়, তাহের সুটকেশ খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মাথার কাছে একটা পিঠা ভাঙ্গা চেয়ার টেনে তার ওপর সাজায়। পরাণ একটা কাঁসার গেলাশে খানিকটা গরম দুধ নিয়ে আসে, এবং তাকে পান করতে বলে। দুধ পান করবার অভ্যেস তাহেরের কোনোকালে নাই, বস্তুত দুধ দেখলেই তার এক প্রকার বিবমিষার উদ্রেক হয়, কিন্তু এখন পরাণের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টাতেই সম্ভবত সে দুধটুকু নিঃশেষে পান করে। পরাণ তার পায়ের কাছে বসে ইস্কুলের গল্প শুরু করে দেয়। তার নিজের লেখাপড়া হয় নাই, কিন্তু লেখাপড়া সে ভালোবাসে। গ্রামের এক মাদ্রাসায় কিছুকাল সে পড়েছিল; তার বাবা তাকে স্থানীয় মসজিদে মোয়াজ্জিনের কাজটি নিতে বলেছিলেন, কিন্তু দু'দিন পরেই কাজটি তার ভাল লাগে নাই। আসলে, সর্বক্ষণ তার নিজেকে পাপী বলে মনে হতে থাকে। এর রকম মনে হবার আদৌ কোনো কারণ আছে কি-না, তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা ওজু অবস্থায় পাক-সাফ থাকাটাও তার কাছে নিঃশ্বাস বন্ধের সামিল হয়ে পড়েছিল। তবে, আজান দিতে সে ভালবাসে এবং এখনো দিয়ে থাকে। পরাণ আরো জানায়, আল্লার কুদরত বোঝা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়, তার প্রমাণ মিলিটারির কাছে সে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, নিরীহ নিবেদিতপ্রাণ বলে প্রমাণিত হয় এবং তার ব্যক্তিগত সম্পদ কিছুই না থাকলেও, যতটুকু আছে তা মিলিটারি এবং বিহারি উভয় তরফেই লুটের হাত থেকে বেঁচে যায়। পরাণ গলা নামিয়ে সংবাদ দেয়, সংবাদটি গতরাতেই তাহের পায়, যে, এই ইস্কুল ছিল মিলিটারির কয়েদখানা, এখানেই লোক ধরে এনে তাদের ওপর অত্যাচার করা হতো এবং এই আপিস ঘর আর ইস্কুলের প্রধান দালানটির মাঝখানে যে সরু জায়গা সেখানে বন্দিদের গুলি করে হত্যা করা হতো। পরাণ অতঃপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে এবং তার সারাদেহে একমাত্র চোখে চাঞ্চল্য দেখে অনুমান করা যায় যে, নতুনতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিষয়ের সন্ধান এখন করে; সম্ভবত কোনো বিষয় খুঁজে পায় না, বা পেলেও তার মনমত হয় না। অবিলম্বে সে নিঃশ্বাস ফেলে তবে এই ক্রিয়াবিশেষণটি অহেতুক যোগ করে জানায় যে, তার মনে হয় না, সোমবার কোনো ইস্কুল খুললেও কোনো ছাত্র আসবে। তার এ সন্দেহের পেছনে কোনো যুক্তি সে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করে না। ফলে, বক্তব্যটি নিরবলম্ব ঝুলে থাকে এবং বিশেষ অস্বস্তিবোধ করে তাহের তথা সে বিচলিত হয়ে পড়ে। প্রায় অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে জানতে চায় পরাণের সন্দেহের পেছনে সূত্রগুলো। উত্তর দিতে গিয়ে পরাণ নিজের বাল্যকাল আমদানি করে। তার বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি ছিল সকলেরই শ্রদ্ধাবোধ, নিজে লেখাপড়া করুক আর না-ই করুক শিক্ষিতজনের প্রতি মানুষের ছিল আন্তরিক আনুগত্য, ছাত্ররা ছিল সমাজের গচ্ছিত মূল্যবান স্বপ্নবিশেষ। কিন্তু আজ ? লেখাপড়ার চেয়ে অন্যপ্রকার শক্তি অর্জনই জীবনের পরাকাষ্ঠা বলে পরিচিত হচ্ছে; সে শক্তি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের অথবা অর্থের। তাই জলেশ্বরীর কিছু তরুণ এবং কিশোর বর্তমানে হয় কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে ক্ষুদে সামন্ত সেজে বসে আছে অথবা সীমান্ত পেরিয়ে পাটের চোরাচালানে মনোযোগ দিয়েছে। যারা এ দুয়ের কোনো দলেই ভেড়ে নি তারা বিদ্যা অর্জনের চেয়ে নকল করে পরীক্ষা পাশ করাই সহজতর মনে করছে। আসলে জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় নকলের এত প্রাদুর্ভাব হয় যে, হাকিম সাহেব পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করেন এবং সেই নিয়ে হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যেই হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। হাফেজ মোক্তার হাকিম সাহেবদের প্রতি অভিযোগ করেন যে, তিনি বিদেশী বলেই জলেশ্বরী ছাত্র-সমাজের প্রতি মমতাহীন। শেষ পর্যন্ত দুই ব্যক্তির দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে পড়ে পরীক্ষাই স্থগিত হয়ে যায়। হাফেজ মোক্তারের চাপে পড়ে সাবেক হেডমাস্টার সকল ছাত্রকে বিনা পরীক্ষায় পাশ ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং পরদিন তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যান। তাঁর যাবার দিন ইস্কুলের কতিপয় ছাত্র ছিন্ন পাদুকার মালা হাতে করে ইস্টিশানে যায় এবং তাকে বাধ্য করা হয় সেটি পরতে। অবিলম্বে সেখানে হাজির হয় ক্যাপ্টেন ভাই। সে এবং তার অনুচরেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে, তাতেও কোনো ফল হয় না। অবশেষে ক্যাপ্টেন ভাই সমবেত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে, তাতে চারজন ছাত্র গুরুতর রকমে আহত হয়। ক্যাপ্টেন নিজে হেডমাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাউনিয়া জংশন পর্যন্ত যায়। এবং তাকে বাহাদুরাবাদ মেলে তুলে দিয়ে জলেশ্বরীতে ফেরে। হাফেজ মোক্তার হাকিম সাহেবকে চাপ দিতে থাকেন ক্যাপ্টেনকে শাস্তি দেবার জন্যে, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে দেখা যায় শহরে মুক্ত এবং নিরুদ্বিগ্নভাবেই ঘুরে বেড়াতে। সে যাই হোক, পরাণ ধারণা করেছিল, অতঃপর আর কোনো শিক্ষক এ ইস্কুলে চাকরি নিয়ে আসবে না; তাই হাকিম সাহেব যেদিন খবর পাঠালেন যে নতুন হেডমাস্টার আসছেন, সেদিন সে ঘোর অবিশ্বাস করেছিল, বস্তুত এ নিয়ে তার স্ত্রীর সাথে কথাও হয়ে গেছে এবং তারা দু'জনেই একমত ছিল যে, কোনো শিক্ষক আসবে না, ইস্কুলও খুলবে না। তাহের মৃদু হেসে এই বাস্তব সত্যটি উপস্থিত করে যে, সে এসেছে, অতএব ইস্কুল না খোলার বা না চলার কোনো কারণ নাই। পরাণ তবু মাথা নাড়ে এবং সে ভঙ্গিতে তার মনোগত খেদ স্ফুরিত হয় অনতিপরে সে জানায় যে, সাবেক হেডমাস্টারের বিদায়ের পর সকল পিতাই এক প্রকার স্থির বিশ্বাস করেন যে অচিরেই ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ লাগবে এবং তাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ফয়সালা করার চেষ্টা করা হবে। কোনো পিতাই চায় না যে তার পুত্রটি গুলির শিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হোক; অতএব, এত সহজ হিসেবের কথা যে, তারা কেউই তাদের পুত্রকে পাঠাবে না। আসলে, একাধিকবার ইস্কুল খোলার ঘোষণা দিয়েও কোনো ফল হয় নাই। তাহের প্রশ্ন না করে পারে না, ইস্কুল খুললে পড়াতেন কে? শিক্ষক কোথায়? হাকিম সাহেব রংপুর জেলা ইস্কুল থেকে দু'জন শিক্ষক অস্থায়ীভাবে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এ ঘোষণাও করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি নিজে দু'একটা ক্লাস নেবেন যতদিন না নতুন শিক্ষক পাওয়া যায়। তাহের বুঝতে পারে, আজ সকালে হাকিম সাহেব যে কিছু অসুবিধার কথা বলেছিলেন তার স্বরূপ কী? হাকিম সাহেবের প্রতি তার একপ্রকার শ্রদ্ধা হয়, যে, তিনি রাজকর্মচারী হয়েও, চলতি কেতার বাইরে; স্থানীয় ইস্কুল তার নির্দিষ্ট দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তিনি তার সরকারি দায়িত্বের সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। একটা খটকা লাগে তাহেরের। গতরাতে ক্যাপ্টেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হাকিম সাহেবের ভূমিকা নিয়ে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল পরাণের কাছে শোনা কাহিনীর সঙ্গে ক্যাপ্টেনের অনুমানের কোনো সঙ্গতি তাহের আপাতদৃষ্টে খুঁজে পায় না। বরং অচিরেই সমস্ত কিছু তার কাছে এক জটিল অংকের মত মনে হয়, এমনকি অসংবদ্ধ একতারা ঘটনার যথেষ্ট সমাবেশ বলে মনে হয় যাবতীয় যা সে জলেশ্বরীতে নেমে পর্যন্ত শুনেছে। তাহের মীমাংসা রচনার আশা ছেড়ে দেয়; তার মন ধাবিত হয় আশু প্রসঙ্গে। পরাণকে সে স্মরণ করিয়ে দেয় ইস্কুল পরিষ্কারের কথা। কাল অবশ্যই যেন জন-মজুর দু'জন উপস্থিত হয়, আর পরাণ যেন তাদের পাওনার চিরকুট নিয়ে হাকিম সাহেব ও হাফিজ মোক্তারের কাছে যায় দস্তখত নিতে, সে জানায় তার কাছে এই নগদ দেনা শোধের মত অর্থ আর উদ্বৃত্ত নেই। হঠাৎ বাতাসে ডিম ভাজার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে সমস্ত প্রসঙ্গ লুপ্ত হয়ে জৈবিক আস্বাদ চিত্ত লালায়িত হয়ে ওঠে। পরাণ 'আপনার ভাত তৈরি' জাতীয় অস্পষ্ট একটা উক্তি করে অন্তর্হিত হয়। তাহের অনুভব করে, ক্ষুধায় তার পাকস্থলী এতদূর পর্যন্ত আক্ষেপিত হচ্ছে যে স্থির বসে থাকা যাচ্ছে না। পরাণ অফিস ঘরে কুজোয় নতুন পানি এনে দিয়েছিল, তাহের এখন হাতমুখ ধুয়ে অধৈর্য রসনা নিয়ে টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে। পরাণ ভাত সাজিয়ে দিতে দিতে আক্ষেপের সঙ্গে জানায়, আজ ডাল আর ডিম ভাজা ছাড়া কোনো ব্যবস্থা করা যায় নি; কুণ্ঠিত স্বরে সে নিবেদন করে, গরিবের রান্নার ত্রুটি তাহের যেন ক্ষমার সঙ্গে গ্রহণ করে। পরাণ আশ্বাস দেয়, আগামীকাল সে ভাল মাছের ব্যবস্থা করবে। এর কোনো কথাই তাহেরের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, পৌঁছুলেও মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করে না। আজ চতুর্থদিনে সে আবার ভাত খায় এবং তার কাছে এই সামান্য ব্যঞ্জন অমৃত বলে বোধ হয়। ক্ষুধার নিজস্ব একটি অস্তিত্ব আছে, দেহের সে দাস নয়, ক্ষুধা দেহাতিক্রান্ত এক অনুভূতি হয়ে দেখা দেয় দেহ যখন ক্ষুধা প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়। আবার, ক্ষুধা যেমন শত্রুতায় প্রবল, পরাজয়ে তা একই মাত্রায় দুর্বল। প্রহরের পর প্রহর যে ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, মুহূর্ত মধ্যে তা অপসৃত হয় খাদ্যের পূজা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তাহের এখন এক প্রকার গভীর অলস্যবোধ করে ক্ষুধানিবৃত্তির পরিণামে, তার চেতনা বিস্তৃত-শিথিল হতে হতে অস্পষ্ট হয়ে আসে, যেমন পরকলা সঠিক স্থাপিত না হলে দুরবিনের ভেতর দিয়ে জগতটাকে দেখায়। পরাণের ক্ষান্তিহীন কণ্ঠস্বর তার কাছে পতঙ্গের গুঞ্জন বলে বোধহয়, চায়ের তৃষ্ণা পায়। তার মনে পড়ে যায়, রোজ রাতে ভাত খাবার পরপরই স্ত্রী তাকে চা করে দিত, আসলে মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেত তার স্ত্রী চায়ের পেয়ালা হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরোজার কাছে সংস্থাপিত। পরাণ অবিলম্বে চায়ের যোগাড় করতে ছোটে। স্ত্রীর নীরব এবং অত্যন্ত প্রীত একটি মুখ অনেকক্ষণ তাকে আবিষ্ট করে রাখে। ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরায় তাহের। বুক ভরে ধোঁয়া নেয়, বাতাস ধীরে-বিলীয়মান ধোঁয়ার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সে। পরাণ চায়ের পেয়ালা সামনে ধরে। একটু অবাক হয় তাহের পরাণের ঘরে এত দামি চিনামাটির পেয়ালা দেখে। সে প্রশংসা না করে পারে না। পরাণ খানিক ইতস্তত করে জানায় যে বিহারিদের অনেক কিছুই অনেকে লুট করে নিলেও সে কিন্তু এক সেট চীনামাটির বাসন ইত্যাদি পয়সা দিয়েই কিনেছে, এই চায়ের পেয়ালাটি সেই সেটেরই অন্তর্ভুক্ত অতঃপর পরাণ তার সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা পাড়ে। আবারো সে জানায় যে ইস্কুলের বেতন দিয়ে তার চলে না, অথচ, শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের প্রতি স্বাভাবিক মমতাবশত সে অন্য কোনো কাজের কথা ভাবতে পারে না। অতএব সে এক মহা দুশ্চিন্তায় দিনপাত করছে; জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে অচিরেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাকে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হবে। এই বলে, সে উৎসুক চোখে তাহেরের দিকে তাকায়, যেন অপেক্ষা করে তাহের তাকে কোনো সংক্ষিপ্ত এবং পরিশ্রমহীন পথ দেখিয়ে দেবেন, যে পথের শেষে সচ্ছলতার অবস্থান। তাহের তার প্রত্যাশা পূরণ করে না, আসলে, সে জানে না যে তার কাছে এমন কোনো উত্তর আছে। সে অর্ধনির্মিলিত চোখে আহার শেষের আলস্য উপভোগ করে চলে। পরাণ তখন আপাতদৃষ্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ইস্কুলের পেছনে বিরাট একটি জায়গা খালি পড়ে আছে, সেখানে কচু ইত্যাদি জংলা গাছ ও লতাপাতার প্রাদুর্ভাব। তাহের হয়ত জানে না, এ এলাকায় গোক্ষুর সাপের কী আধিপত্য। পেছনের সেই জংলা জায়গাটি, বলতে গেলে, গোক্ষুরেরই রাজত্ব বিশেষ। ইস্কুলের এতগুলো ছাত্রের এত কাছে এ ধরনের ভয়াবহ প্রাণীর উপস্থিতি কি কাম্য ? ইস্কুল নিয়ে আপাতত এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই, নতুন এই সমস্যাটিও তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাহের স্থির বোঝে যে, এখানে তার কর্তব্য এক প্রকার নয়, বহুবিধ এবং সবক'টিই আশু মনোযোগ এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দাবি করে। অচিরেই সে টের পায়, পরাণের এ-প্রসঙ্গ উত্থাপনের আবৃত্ত কারণটি। পরাণ চায়, পেছনের ঐ জঙ্গল সাফ করে তাতে তরিতরকারি লাগাতে, তাতে সাপের উপদ্রব কমে এবং পরাণেরও কিছু আর্থিক সুরাহা হয়। পরাণ আরো একবার জানায় যে, ঐ জায়গাটুকু ইস্কুলের কোনো কাজে লাগে না, পরিষ্কার করবার পরও কোনো কাজে লাগবে না। এ অবস্থায় সে যদি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারে তো সে চেষ্টার সুফলও একমাত্র তারই প্রাপ্য। এই প্রস্তাবটি রেখেই পরাণ রাতের মত বিদায় নেয় এবং আশ্বাস দিয়ে যায় যে, রাতে কোনো প্রকার আবশ্যক হলে তাকে শুধু ডাক দেবার অপেক্ষা, সে প্রায় সজাগই থাকে সারারাত, তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের আমল থেকে ভাল ঘুম হওয়া তার বন্ধ হয়ে গেছে। আরো সে সাবধান করে দিয়ে যায়, শোবার সময় মশারি ভাল করে গুঁজে শোয় যেন তাহের, অনেক সময় গোক্ষুর সাপ উত্তাপের সন্ধানে বিছানায় সেঁদোয়। তৎক্ষণাৎ কোলের কাছে পা টেনে নিয়ে তাহের সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে বসে, নিমিষে আহারজনিত আলস্য এবং আমেজ অন্তর্হিত হয়, একটা ঠাণ্ডা আতংক স্থান করে নেয় তার বদলে। পরাণ বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় যায় এবং মশারি ভাল করে গুঁজে দেয় চারদিকে, বারবার পরখ করে দেখে কোনো ফাঁক আছে কি না। মাথার কাছে লণ্ঠনের শিখা স্তিমিত করে দিয়ে শান্তি লাগে না, আবার তা উজ্জ্বল করে দেয় সে, দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দেয়, যেন সাপ এলে চোখে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চারদিকে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়, যেন অবিলম্বে কিছু ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু ঘটে না, তাই বলে নিশ্চিত বোধ করাও যায় না; মশারির চাঁদোয়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তাহের। কোথাও একটা শেয়ালের ডাক শোনা যায়, কোথাও একটা শিশু কেঁদে ওঠে, তারপর মাটির অতল থেকে গুরুগুরু একটা ধ্বনি ওঠে, সে ধ্বনির উৎস দূরে কিন্তু অতি অস্পষ্ট একটা কম্পন অনুভব করা যায় বিছানার নিচে, মাটিতে। জলেশ্বরীতে রাতের ট্রেন এলো। কাল এই ট্রেনে তাহের এসেছিল। সম্পূর্ণ একটা দিন পার হয়ে গেল। তার মনে পড়ে যায়, বাবা একটি কথা বলতেন, রোজ রাতে শোবার পর, ঘুমোবার আগে সারাদিনের কথা মনে করবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অভিজ্ঞতার হিসেব নিবি। বাবা চোখ বুজে, একহাত চোখের ওপর ঢাকা দিয়ে, মৃদু পা নাড়াতেন। হয়ত তখন তিনি সারাদিনের হিসেব মেলাতেন, সারাদিনের নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় তাহের, স্ত্রীর জন্য তার অস্তিত্বের ভেতর কোনো অনুপস্থিতির বোধ নেই। তার জীবন যেন একটি বাসে চেপে কোথায় যাওয়া, পথে একজন উঠেছিল এবং তারই পাশে আসন গ্রহণ করেছিল, তার গন্তব্য এখনও আসে নি, তাই এখনো সে যাত্রী, এখনো চলমান। স্ত্রীকে সেকি ভালবাসত না? তার বিবাহ ছিল আয়োজিত। মায়ের পছন্দে বিয়ে করেছিল সে। কিছু দিন থেকেই মা তাকে বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন, ঠিক যে আগ্রহের সঙ্গে তিনি পুত্রকে বিদ্যার্জনের জন্যে তাগাদা করতেন, একই প্রকার তাড়নায় তিনি তাকে সংসারেও প্রবিষ্ট করান। হাসনা, তার স্ত্রী, তার সঙ্গে প্রথম দেখা বিয়ের রাতে। যেন কেউ তাকে বলেছিল, একটি উপহার রয়েছে তার জন্যে, অবশেষে এলো সেই উপহার, রঙিন কাগজে মোড়া, বাইরে থেকে জানবার উপায় নেই ভেতরে কী আছে, কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে, যে-কোনো উপহারই চিত্তে আনে এক প্রকার চাঞ্চল্য এবং সাগ্রহ অস্থিরতা, সেই অস্থিরতা নিয়ে সে মোড়কটি উন্মোচিত করেছিল আর ভেতরে যা দেখেছিল তা অত্যন্ত প্রীত করেছিল তাকে. মনে হয়েছিল, এরই জন্যে সে অপেক্ষা করেছিল, ঠিক এই উপহারই সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। হাসনাকে তার ভাল লেগেছিল প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্ত থেকেই। আর হাসনার কী মনে হয়েছিল তা তার জানা নেই। যেহেতু এই ঘটনা দ্বিপক্ষীয়, তাই অবিরাম একটি প্রয়াস ছিল তার, যে. হাসনা কি একই প্রকার কৃতজ্ঞ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তাকে, এই প্রশ্নের মীমাংসা সন্ধান করা। অকালপক্ক বালিকার অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে হাসনা তার এ উদ্যমকে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা করে রাখতে সক্ষম হয়। বস্তুত প্রত্যক্ষভাবে তাহের কখনোই জানতে পারে নাই যে হাসনা তাকেই নিবেদন করেছে তার অস্তিত্বের সমগ্র ফসল। বর্তমানে তার অনুপস্থিতিতে, পেছনের দিকে তাকিয়ে সে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় আরো একবার নিয়োজিত হয় তাহের। কিন্তু জীবদ্দশায় যা জানা সম্ভব হয় নাই, মৃত্যুর পর তা কি সম্ভব হতে পারে? মৃত্যু শুধু জীবন নয়, স্মৃতিও নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়; মৃত্যুর পর, মৃত্যুজনের যে স্মৃতি চিত্ত বহন করে, তা অতীত থেকে আহরিত শ্রেষ্ঠ ফসলের গুচ্ছ নয়, আবশ্যিকভাবেই কল্পনার নবীন ফসল তা। সহযাত্রীর মৃত্যুর পর, তাকে যেভাবে চিত্রে জীবিত রাখলে জীবিতের জীবনযাত্রা সুসাধ্য হয়, সেইভাবেই চিত্র ও চেতনা যুগলে তাকে নির্মাণ করে। বিগতের সঙ্গে এই নবাগতের কোনো প্রকার যোগ নাই, বস্তুত, যোগহীনতাই এ নির্মাণের প্রথম শর্ত। হাসনাকে সে নির্মাণ করেছে কীভাবে? এই প্রশ্ন উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনার কতগুলো স্থিরচিত্র দেখা দেয়। সেই চিত্রগুলোতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাসনাকে প্রধানত গৃহকর্মে নিযুক্ত দেখা যায়। রান্নাঘরে রন্ধনে ব্যস্ত হাসনা, শোবার ঘরে শয্যায় কোন রঙের চাদর বিছানো হবে সেই জরুরি প্রশ্নে চিন্তিত হাসনা, সিনেমা দেখতে বেরুবার আগে দরোজায় তালা দিয়ে বারবার সেই তালার বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখায় নিবিষ্ট হাসনা, তাহেরের জামায় বোতাম লাগাতে সুঁচে সুতো পরাবার জন্যে একাগ্র হাসনা, দোকানে একই পণ্যের দুই বিভিন্ন মার্কার ভেতরে তুলনামূলক গুণ বিচারে মনোযোগী হাসনা প্রায় অন্তহীন এই চিত্রসম্ভার। অতএব, সিদ্ধান্ত তাহলে এই যে, হাসনার সঙ্গে জড়িত তার জীবনের বহিরঙ্গ ? তার কাছ থেকে অনবরত সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে, তাহের, হাসনার ওপর তার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ভর করত ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহের জন্যে। বস্তুত, আপাতত এ ছাড়া সে আর অন্য কোনো উপযোগিতা খুঁজে পায় না হাসনার। অন্ধকারে সিগারেট হাতড়ে ফিরত তাহের, হাসনা মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে খুঁজে দিত; 'একদিন তুমি বিছানায় আগুন লাগাবে'। এখন স্তিমিত নয়, বরং অতি উজ্জ্বল শিখায় লণ্ঠন জ্বলছে, সিগারেট খুঁজে পেতে মোটেই কষ্ট হয় না, অনুপস্থিত হাসনার সেই তিরস্কার স্মরণ করে তাহের সাবধানে এখন সিগারেট ধরায়। তাহলে এখনো সে হাসনার ওপর একদিক থেকে নির্ভরশীল। এখনো হাসনার অনুশাসনে তার জীবন নির্বাহ নিয়ন্ত্রিত। তাই কি ? হাসনা বেঁচে থাকলে তাকে কি সে আসতে দিত এই ত্রিভুবনের অন্তে স্থাপিত জলেশ্বরীতে ? আর যদিও বা আসতে দিত, হাসনা তাকে বাঁ হাতের সব কটা আঙুল একত্রে তুলে নিষেধ করত, দ্যাখো বাপু, গোলমালের ভেতরে জড়িয়ে পড়ো না। ইস্কুল নিয়ে সম্ভাব্য গোলমালগুলো অবিলম্বে তাহেরকে প্লাবিত করে যায়। ছাত্র পাস না করানো নিয়ে স্থানীয় এমপি হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে হাকিম সাহেবের বিতণ্ডার কথা স্মরণ করে সে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন হেডমাস্টারের বিদায় এবং ইস্টিশনে ছাত্রদের ওপর ক্যাপ্টেনের গুলিবর্ষণ তাকে শংকিত করে তোলে যে, তাকেওনা এভাবেই একদিন বিদায় নিতে হয়! অভিভাবকদের আশংকা, পরাণ তাকে বলেছে, একদিন ইস্কুলের ভেতরেই গুলি চলবে, যদি সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় ? হাসনার কথা আবারো মনে পড়ে যায় তার। হাসনা অবশ্যই তাকে নিষেধ করত গোলমাল থেকে দূরে থাকতে, এমন কি জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যেতেও উৎসাহ জোগাত। একদিক থেকে তাহের নিশ্চিত বোধ করে যে, হাসনা আর বেঁচে নেই, পদেপদে তাকে বাধা দেবার মত মানুষটি আর এ সংসারে নেই। এক প্রকার অনুযোগ প্রবল হয়ে ওঠে তাহেরের মনের মধ্যে। মনে পড়ে যায়, একটার পিঠে আরেকটা সিগারেট ধরালেই হাসনা ভ্রু কুঞ্চিত করত। কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে সারারাত নীরব থেকে হাসনা তাকে শাস্তি দিত। স্যান্ডেল পরে রওনা হলে, হাসনা পেছনে পেছনে প্রায় ধাওয়া করে বলতো, কেন তোমার জুতোজোড়া কী হলো ? মুরগির রান তাহের পছন্দ করত না, তার জন্যে দিনের পর দিন শুনতে হয়েছে যে, বোধহয় তোমার মা তোমাকে কোনোদিন ভাল খেতে দেয় নি। এ ধরনের শাসন এবং উক্তিগুলো তাহেরকে এখন অত্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে, এবং হাসনা জীবদ্দশায় যা সম্ভব হয় নাই, এখন সেই উত্তরগুলো তার মনে পড়ে যায় এবং মনের মধ্যে উচ্চকণ্ঠেই সে বলতে থাকে, আমার যা ভাল লাগে তাই করি। এই কথাগুলো আবৃত্তি করে তাহের খানিকটা প্রশমিত হয়। এতদিনে হাসনাকে মনের মত উত্তর দেয়া গেছে মনে করে সে বেশ লঘু বোধ করে। এবং আরো একটি সিগারেট ধরায়, যেন হাসনার উপস্থিতিতেই সে একটার পিঠে আরেকটা ধরিয়ে প্রমাণ দিল যে, তার বক্তব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কত অসার। এবং অবান্তর। 'আমার যা ভাল লাগে আমি তাই করি'— সহাস্য এই উক্তির অন্য এক অনুষঙ্গ তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ইস্কুল পরিচালনায় সে কি এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবে ? না কি, অসম্ভব বলে দেখতে পাবে যে, যা ভাল লাগে তা সব সময় করা যায় না। তাহলে হাসনারই জিৎ হয়ে যাবে এক অর্থে, এই অর্থে যে, হাসনা তার শাসনের মাধ্যমে যেন অনবরত জ্ঞাপন করত যে, যা ভাল লাগে তা সব সময় করা যায় না। আর সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আপাতত এটুকু স্থির বলে দেখতে পায় তাহের যে, জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় আবার খোলাটা এক প্রকার জেদপ্রসূত। সে জেদ হাকিম সাহেবের। পরীক্ষা-সংক্রান্ত ঐ ঘটনায় তিনি পরাজিত বোধ করেছিলেন বলেই ইস্কুল খোলার জন্যে তার আগ্রহ এতটা উদ্দাম। তাহের এখন পরিষ্কার বুঝতে পারে, কেন হাকিম সাহেব ঢাকায় তাকে অমন তাড়াহুড়ো করে চাকরি দিয়েছিলেন। চাকরি পেয়ে তাহের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে, কারণ এ ধরনের একটা ক্ষেত্র সে খুঁজছিল হাসনার মৃত্যু এবং দেশ স্বাধীন হবার পর। স্বাধীনতার পতাকাশোভিত উল্লাসের ধ্বনি নিনাদিত ঢাকায় বসে থেকে তার মনে হয়েছিল দেশ শুধু রাজধানী ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়, ঢাকা বরং দেশের একটা মুখোশ মাত্র, দেশ আসলে ছড়িয়ে আছে সারাদেশে, তাই সে অনুভব করছিল, দেশের অভ্যন্তরে তার যাওয়া প্রয়োজন এবং নিজের ক্ষেত্রে দেশের জন্যে কিছু করা আশু কর্তব্য। তার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় ইস্কুলে তাদের রচনা লিখতে হতো, 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'। বড় হয়ে জেনেছে যে, আহ্বানটি দিয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতা সুরেন ব্যানার্জি। তাঁর সেই ডাকে, সেকালে কোলকাতার বহু মেধাবী ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক নগরী ছেড়ে ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে-গ্রামে তারা শিক্ষকতা করতে শুরু করেছিলেন এই মহৎ ব্রত নিয়ে যে, দেশের তরুণ শক্তিকে তারা সঠিক ধারায় গড়ে তুলবেন, যেন এই নব্য তরুণেরা ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন থেকে একদিন মুক্ত করতে পারে। শুধু শিক্ষক কেন, তাহেরের মনে আছে, বহু চিকিৎসকও একই প্রেরণায় গ্রামে চলে যান, এই জলেশ্বরীতেই ছিলেন নগেন ডাক্তার, যিনি এখানে আসবার আগে পর্যন্ত ছিলেন কোলকাতার বিশিষ্ট তরুণ চিকিৎসক। নগেন ডাক্তার আঁটো করে পরা ধুতির ভেতরে শার্ট গুঁজে সাইকেলে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামে রোগী দেখতে যেতেন। ফর্সা ধবধবে চেহারা ছিল তার। সেই নগেন ডাক্তার এখন কোথায় আছেন, কে জানে ? হয়ত এখানেই, হয়ত পাকিস্তান হবার সময়ে চলে গেছেন ভারতে, সেখানে। কাল একবার সে খোঁজ করবে। জলেশ্বরীতে আসবার আগে নগেন ডাক্তার, নৃপেনদা মাস্টার এদের কথা বারবার মনে হয়েছিল তার। এখন ইস্কুলের অফিস ঘরে শুয়ে থেকে, সাপের ভয়ে জেগে থেকে, আরো একবার মনে পড়ে যায় তাদের কথা। আরো একবার উজ্জীবিত বোধ করে। তার মনে হয়, সমস্ত বাধা-বিপত্তি সহজেই তুচ্ছ করবার মত শক্তি তার চিত্তে এবং প্রয়োজন হলে বাহুতে তার রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সে যদি কোনো অংশ নিয়ে না থাকে তো স্বাধীনতা আসবার পর ভিন্নতর সংগ্রামে সে পুষিয়ে নেবে। বস্তুত, এ সংগ্রামই তার কাছে মহত্তর এবং অধিকতর সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'— এই জলেশ্বরী ইস্কুলেই রচনাটি তাকে লিখতে হয়েছিল, আর এখন সে নিজের বালক বয়সের সেই প্রতিজ্ঞাপূরণে আর কোথাও নয় এসেছে এই জলেশ্বরীতে। তাহেরের মনে হয় এই যোগাযোগটি আকস্মিক তো নয়ই বরং গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। সে নিজেকে এক উজ্জ্বল চিত্রের ভেতরে সংস্থাপিত দেখতে পায় এবং অবিলম্বে ঘুমিয়ে যায়। সময় আমাদের ধারণাসৃষ্ট, অতএব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময়জ্ঞান নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাহের যখন জেগে ওঠে হঠাৎ, লণ্ঠন তখন উজ্জ্বল জ্বলছে, জানালা দিয়ে বাইরে গাঢ় রাত দেখা যাচ্ছে, সে বুঝতে পারে না কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে। ঘুম ভাঙল কীসে? আবার সে-ই ডাক ওঠে; এ-এ-রে-এ-এ। অদূরেই কোথাও ক্যাপ্টেন জানান দিয়ে চলেছে তার উপস্থিতি। সারারাত কি সে এমনি করে ঘুরে বেড়ায়? জলেশ্বরী যখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে, তখন কি একমাত্র সে-ই জেগে আছে? স্বপ্ন এবং বাস্তব মিশ্রিত হয়ে যায়, বস্তুত, বাস্তবকে স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়; মনে হয়, তাহের স্বপ্নের ভেতরে ক্যাপ্টেনের ঐ সংকেত শুনছিল। সম্ভবত তাই। ক্যাপ্টেনের কথা সে ভাবছিল, বিশেষ করে সাবেক হেডমাস্টারের বিদায় দিনে ইস্টিশনে তার আবির্ভাব এবং তাকে পাহারা দিয়ে কাউনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কাহিনী শোনার পর থেকে তার চেতনা কিছুতেই ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে যেতে পারছিল না। তাহেরের মনে হয়, জলেশ্বরীতে এ পর্যন্ত যতজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের ভেতরে ক্যাপ্টেনই তার নিকটতম। কেন এটা মনে হয়, তা সে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়। ক্যাপ্টেন তার প্রতি কোনো প্রকার স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখায় নি, বরং ভাত খাবার হোটেলে আজমীর-পিপাসুর সঙ্গে তার আচরণে তাকে করুণাহীন বলেই মনে হয়েছে তার এবং আরো মনে হয়েছে প্রয়োজনে সে তাহেরের প্রতিও একই মাত্রায় করুণাহীন হতে পারে। তবু ক্যাপ্টেনকেই তার আপনতম বলে এখন বোধ হয় এবং তাকেই সে মনে মনে কামনা করে যে প্রভাতে সবার আগে তার সঙ্গেই যেন তাহেরের প্রথম দেখা হয়। এই দেখা করবার আবশ্যকতা কী, তাও সে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না; কেবল এক প্রকার তীব্র তাগিদ বোধ করে। আবার সেই ডাক শোনা যায়; এ-এ-রে-এ-এ। ধ্বনি দূরে অপসৃত হয়ে যায়। আরো একবার শোনা যায়, এবং তা এক অনন্ত প্রমাণ দূর থেকে। জলেশ্বরীর পথে পথে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভেতরে ক্যাপ্টেন হেঁটে চলেছে; শহীদ বরকতউল্লাহ রোড দিয়ে, শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড পেরিয়ে, শহীদ গেদু মিয়া লেনের ভেতর দিয়ে, চাঁদবিবির পুকুরের পাশ দিয়ে, শহীদ সিরাজ আলী রোডের ওপর দিয়ে, আরো সমস্ত শহীদের নামাংকিত পথ পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন। জীবিত সে, একা, বারবার পাক খেয়ে ঘুরছে। অকস্মাৎ, তাহেরের মনে এই সত্যটি উদ্ভাসিত হয় যে, গোটা শহরটাই এক বিশাল গোরস্থানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দু'পাশে বাড়িঘরগুলোকে কবরের মত মনে হয় তার। চতুর্দিকে জীবিতের চেয়ে মৃতের নিঃশ্বাস সে টের পায়। তাহেরের আরো মনে পড়ে যায়, জলেশ্বরীতে যার সঙ্গেই সে কথা বলেছে, তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর সংবাদ বেশি শুনিয়েছে তাকে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ যে মৃত্যু নামক এক রাজত্বের প্রজায় পরিণত হয়েছে, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে, এক প্রকার হতাশা তাকে অবসন্ন করে ফেলে; সে আর ঘুমের ভেতরে ফিরে যেতে পারে না। তাহের উঠে বসে, সাবধানে পা নামায়, সাপের ভয়ে মৃত্যুর শীতলতা তাকেও খিন্ন করে; সে টেবিলের পাশে চেয়ারে পা তুলে বসে দু'হাতের ভেতরে মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে থাকে। তার ছোটবেলায় যে প্রাণবন্ত জলেশ্বরীকে জানত, এখানে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে জলেশ্বরীর কল্পনায় সে উদ্দীপ্ত বোধ করেছিল, তার সঙ্গে সদ্য পরিচিত এই শহরের কোনো প্রকার মিল নেই। তার পূর্ব-প্রত্যাশাগুলো নিতান্তই অলীক এবং বালসুলভ বলে তার কাছে এখন প্রতীয়মান হয়। সে কী প্রত্যাশা করেছিল? দেশ স্বাধীন হয়েছে, জলেশ্বরীর আশেপাশে তীব্র মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ সে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রচারিত সংবাদে শুনেছে, গোটা বাংলাদেশে জলেশ্বরীতেই প্রথম মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখ যুদ্ধে শহরের দখল নেয়— অতএব, তাহেরের ধারণা জন্মেছিল, জলেশ্বরী এখন মহত্তর জীবন নির্মাণে নিয়োজিত একটি শহর। তার ব্যক্তিগত গর্ব ছিল এই কারণে যে, এখানেই তার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু, বাস্তবে সে দেখতে পেল, ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতেই এখানকার মানুষ অধিক স্বচ্ছন্দ, জীবনের চেয়ে মৃত্যুর উপাখ্যানেই তাদের প্রবলতর আগ্রহ, পদক্ষেপের বদলে স্তম্ভিত হয়ে থাকাই প্রিয়তর। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর বিস্তারিত নিষ্করুণ বর্ণনাদানে জলেশ্বরীর প্রতিটি মানুষকে সে দেখতে পেয়েছে কোনো পল্লী কবির চেয়েও প্রতিভাধর। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা জলেশ্বরীর মানুষকে ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তীর্ণ করবার বদলে তাদের আরো সংকীর্ণ ব্যক্তিচেতনার ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে, যেমন মজাপুকুরে বহুদিন পাঁক কোনো হতভাগ্যকে আকর্ষণ করে থাকে। তাই, হাকিম সাহেবের বারান্দায় সেই বৃদ্ধ তার জমি সম্পর্কে চিন্তিত, ভদ্রমিয়া প্রথম সাক্ষাতেই ইস্কুলের খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করবার চুক্তি আবার ফিরে পেতে নির্লজ্জ রকমে আগ্রহী, পরাণ ইস্কুলের পতিত জমিটুকু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দ্বিধাহীন রকমে প্রস্তুত, জন-মজুর দু'জন বায়না নিয়ে কাজে হাত না দিয়েই উধাও। আজ, এবং কেবল আজই তাদের কাছে সত্য; আপন অস্তিত্ব এবং কেবল আপন অস্তিত্বই তাদের কাছে প্রধান। অথচ, তাহের তার অতীত ফেলে, তার অভ্যস্ত পরিবেশ নির্মম হাতে পেছনে রেখে, জলেশ্বরীতে এসেছে নতুন এবং অর্থপূর্ণ এক ভবিষ্যতের সন্ধানে। নিজেকে প্রতারিত বলে মনে হয় তার। স্ত্রীর আত্মহত্যাতেও সে এতখানি বিচলিত বোধ করে নি। এক দয়াহীন চাবুক তার পিঠের ওপর পড়তে থাকে। আবার দূর থেকে সেই ডাক ভেসে আসে; এ-এ-রে-এ-এ। তারপর কয়েকটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। মনে হয়, কেউ দৌড়ে যাচ্ছে কাউকে ধরতে। বন্দুকের একটা আওয়াজ হয়। তারপর আরো কয়েকটা পটকা ফোটার মত পাতলা আওয়াজ সারিবদ্ধভাবে শোনা যায়। নেমে আসে অখণ্ড স্বস্তিহীন নীরবতা। আর কোনো ধ্বনিতে তা বিদীর্ণ হয় না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবার পরও ক্যাপ্টেনের সেই সংকেত ধ্বনি আর শোনা যায় না। কেবল অসংখ্য গাছের মাথায় মাঝে মাঝে বাতাসের প্রবল প্রবেশ সরসর শব্দ ওঠে এবং চারদিকের স্তব্ধতা প্রবহমান সেই শব্দে আরো অবিভাজ্য হয়ে যায়। গত রাতেও তাহের গুলির শব্দ শুনেছিল; আজ এখন একাধিক গুলির শব্দ শুনে আবার তার মেরুদণ্ডে শীতল প্রবাহ চলাচল করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসে ঢাকায় এমন কোনো রাতের কথা সে মনে করতে পারে না যখন নেপথ্যে, দূরে গুলির শব্দ সে শোনে নাই। কিন্তু তখন তা অন্যপ্রকার অনুভূতি সৃষ্টি করত। সে অনুভূতি সময় ধারণা রহিত অবসন্নতার অনুভূতি। আপন দেহ ক্রমশ কুঁকড়ে একটা ক্ষুদ্রকায় পিণ্ডে রূপান্তরিত হবার অনুভূতি। মুখাবয়বে চোখ-কান-নাক-ঠোঁট পুরু একটা জান্তব ত্বকে আবৃত হবার অনুভূতি। সমস্ত নির্মাণের ভিত্তি যে কঠিন ভূমি, সেই ভূমি এক প্রকার শীতল তীব্র আগুনে অনবরত বাষ্পীয় আকার ধারণ করবার অনুভূতি। কোনো অদৃশ্য উৎস থেকে মন্থর এক আলকাতরার নদী উৎপন্ন হবার অনুভূতি। কণ্ঠস্বর চূর্ণিত কাচ হয়ে যাবার অনুভূতি। গ্রীষ্মের গাছগুলোতে অতিকায় ফুলগুলোতে অপ্রতিরোধনীয় পচন ধরবার অনুভূতি। অন্নবিকারে সমাধিস্থ হবার অনুভূতি। সংখ্যাজ্ঞান, শুদ্ধতম যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের শরীরে পিঙল এবং দীর্ঘ লোম উৎপন্ন হবার অনুভূতি। রৌদ্রে উদ্ভাসিত স্বচ্ছ নীল আকাশে অকস্মাৎ এক ধূসর চাদর তরঙ্গায়িত হয়ে ভেসে যাবার অনুভূতি। তীক্ষ্ণস্বর বাঁশির ভেতরে পার্শ্ববর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যক্তিটিকে চিৎকার করেও এক অক্ষর সংবাদ পৌঁছে দিতে না পারবার অনুভূতি। প্রভাতে উঠে পরিচিত প্রতিটি বস্তুর আকৃতি দ্বিগুণ বর্ধিত দেখার অনুভূতি। এ-এ-রে-এ-এ। ক্যাপ্টেনের সংকেতধ্বনি জলেশ্বরীর রাতে তৃতীয় প্রহর ভেদ করে আবার ভেসে আসে। এখন তা আকাঙ্ক্ষিত আশ্বাস উচ্চারণের মত শোনায়। এতক্ষণ পর যেন নিমজ্জমান চেতনা একটা অবলম্বন খুঁজে পায়; তাহের অবিলম্বে সেটা আঁকড়ে ধরে, অচিরে তার কপাল স্থাপিত হয় টেবিলে এবং টেবিল একটা ভাসমান নৌকোর মত সহসা দুলে উঠে দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় অত্যন্ত সাবলীল গতিতে। পরাণ এসে তাকে জাগায় এবং বলে যে, দরোজায় খিল না দিয়ে ঘুমোন তার উচিত হয় নাই। পরাণ আরো বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখে। কেন, বিছানা কি তার পছন্দ হয় নাই? তাহলে আজই একটা চৌকি বানাবার বায়না দিতে হয়। কেরোসিনও আজকাল পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও বিস্তর দাম, বলতে বলতে পরাণ লণ্ঠনটা নিবিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাহের বেরিয়ে এসে দেখে, জন-মজুর দু'জন এই কাকডাকা ভোরে এসেই কাজে লেগে গিয়েছে, ইতিমধ্যেই একাধিক ক্লাশঘর থেকে আবর্জনা বের করে বারান্দায় স্তূপাকার করে রেখেছে, তার ভেতর থেকে ইঁদুর আরশোলাজাত গাঢ় একটা আতপগন্ধ বেরুচ্ছে। সেই ঘ্রাণ অবিকল তার মায়ের ভাঁড়ার পরিষ্কার করবার বাৎসরিক দিনটির মত। সাধারণত ঐ দিনটি আসত ঈদুল ফিতরের কয়েকদিন আগে। শিশুদের কাছে সেটাই ছিল উৎসব শুরুর ঘণ্টাধ্বনি। বুকের ভেতরে গুরু গুরু করে উঠত; ঝলকে ঝলকে খুশির বাতাস এসে গালে মুখে লাগত; দর্জি এসে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মাপ দিয়ে যেত; বাবা হাতের পিঠে শুঁকে শুঁকে ঘোষের কাছ থেকে ঘি কিনতেন; উঠানে এক পাল ঝুটিওয়ালা খাসি মোরগের ছুটোছুটি শুরু হয়ে যেত যতদূর পর্যন্ত তাদের পায়ের দড়ি যায়; ঈদের দিন পর্যন্ত রোজ ভোরে ঘুম ভাঙত ঐ মোরগের মিলিত উষা-আবাহনীতে। তাহের এখন অবিকল তেমনি এক উৎসবের আসন্ন পাদপাত মনের মধ্যে শুনতে পায়; নির্ভার এক ধরনের চাঞ্চল্য তাকে সমুদ্রের সবিরাম ঢেউয়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত দুপুর সে জন-মজুর দু'জনের কাজের তদারক করে, তাদের সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দিতে থাকে, দেয়ালের লেখা মোছে, থামের দাগ তোলে, জানালায় যে কটা কাচ এখনো অবশিষ্ট আছে তা পরিষ্কার করে। তাহের সিদ্ধান্ত নেয়, দ্বিতীয় কোনো শিক্ষকের আপাতত অনুপস্থিতিতে সে সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত এই চার ক্লাসের সমুদয় ছাত্রকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে বসতে দেবে এবং সে একাই ক্লাস নেবে পর্যায়ক্রমে। একদলকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে লেখায় বসিয়ে, আরেক দলকে সে পড়া বোঝাবে এবং একেকদিন একেক বিষয়, একটিমাত্র বিষয়ে সে পড়াবে। অঙ্কের বেলায় কিছুটা অসুবিধে হবে, আর আরবি সে আদৌ পড়াতে পারবে না; তবে সে নিজে যদি ক্লাসের একটা অংক বই যোগাড় করে বার কয়েক দেখে নেয় তাহলে কিছুদিন অন্তত চালিয়ে নিতে পারবে, আর আরবি আপাতত স্থগিত থাকলেও বিশেষ অসুবিধে হবে না। তাহের আশা করে, অচিরেই সে হয়ত হেড মৌলবি সাহেবকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে হাকিম সাহেবকে অনুরোধ করে, অথবা, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে; নয়ত সন্ধান করতে হবে স্থানীয় কেউ আছেন কি না যিনি আরবি জানেন, সম্ভবত শহরে একজন কাজি আছেন, বিবাহ-তালাক-ফতোয়া দেবার জন্যে, সে রকম কেউ যদি থাকেন তাহলে তো সমস্যাই নেই। মৌলবি প্রসঙ্গে তার মাথায় জেলখানার কথা ঘুরতে থাকে, সেই সূত্রে মনে পড়ে যায় যে, হেড মৌলবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি মিলিটারির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, আর সেই সূত্র ধরে তার স্মরণ হয় যে, এখানে আসবার প্রথম রাতে সে মিষ্টির দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিল, এই ইস্কুলবাড়িতে বাঙালি এগারজন গালামালের কারবারিকে মিলিটারিরা এনে হত্যা করেছিল, তাদের রক্তের দাগ নাকি এখনো কোনো কোনো থামে বর্তমান। তাহের চঞ্চল হয়ে পড়ে। সকাল থেকে খুশির যে চাঞ্চল্য তাকে শিহরিত এবং উদ্যমী করে রেখেছিল, এ চাঞ্চল্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হঠাৎ সে গতিহীন, এমন কি লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। জন-মজুর দু'জনকে কাজে ব্যস্ত রেখে সে প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এবং প্রতিটি থাম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। নানা প্রকার দাগ দেখতে পায় সে, কালির দাগ, চুনের দাগ, আঠার দাগ, আলকাতরা, কাঠ-কয়লা, ইটের টুকরো দিয়ে ঘষা ইত্যাদি বহু কিছুর দাগ; জায়গায় জায়গায় চুনকাম খসে গিয়ে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও কোথাও আস্ত ইট খসিয়ে নেবার ফলে খোড়লের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এত কিছুর ভেতরে কোনটা রক্তের দাগ বা কোথায় রক্তের দাগ সে সম্পর্কে আদৌ কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ দাগই বিবর্ণ এবং গাঢ় খয়েরি, তার প্রায় সবগুলোই রক্তের দাগ বলে নির্ণয় করা যেতে পারে। পরাণ বাজার থেকে দুধ বিক্রি করে ফেরে; সে কাছে এসে জানতে চায় তাহের কি থামের এই দাগগুলোও পরিষ্কার করতে চায় ? পরাণ তার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে যে, এ কাজ রাজমিস্ত্রির এবং যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ। 'আপনাকে দেখাই' বলে পরাণ তাকে একটা বড় ক্লাস ঘরে নিয়ে যায়। এ ঘরটায় জন-মজুর দু'জন এখনো হাত লাগায় নি, তাহেরও ইতিপূর্বে আসে নি। ঘরে এসেই তাহেরের চোখে পড়ে চার দেয়ালে উর্দু এবং ইংরেজি হরফে অসংখ্য লেখা, ব্যক্তির নাম, শহরের নাম, দেশের নাম, এবং স্লোগান; হানিফ, মাজহার, সোহেল বশির, মাজিদ, চাকদারা, সেরাই সিধু মণ্ডি বাহাউদ্দিন, ধুদিয়াল, পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জেনারেল নিয়াজি জিন্দাবাদ। পরাণ জানায়, এ ঘরে ছিল সিপাহিদের আস্তানা, আর এর পাশের কামরাতেই বন্দিদের রাখা হতো। পরাণ তাকে সে ঘরে নেবার চেষ্টায় আমন্ত্রণের জন্যে একটা হাত এবং গন্তব্যের দিকে একটা পা বাড়ায়। তার আগেই তাহের প্রায় চিৎকার করে ওঠে, এবং নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে ওঠে। তবু সে তারস্বরে জানায় যে, এসব দেখবার সময় তার নেই, কোনো প্রকার আবশ্যকতা আছে বলে সে বিবেচনা করে না। সেই সঙ্গে তাহের এটা জানাতেও ভোলে না যে, বাজার থেকে ফিরতে পরাণ অনেকটা দেরি করেছে; অবিলম্বে সে যেন মজুরদের সঙ্গে হাত লাগায়। তাহের দ্রুত পায়ে অফিস ঘরে এসে ধপ করে বসে পড়ে এবং ঘনঘন ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে। কেউ তাকে এক মুহূর্তের স্বস্তি দেবে না; অতীত থেকে কেউ দৃষ্টি ফেরাতে চাইবে না। সবাই তাকে একই কথা বারবার বলেও তুষ্ট নয়। সবার ধারণা যেন এই যে সে শুধু জলেশ্বরীতেই নবাগত নয়, গোটা বাংলাদেশেই সে বহিরাগত, অতএব, গত বছরে বাংলাদেশে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; এদেরই সে দায়িত্ব যেন বর্তেছে তাকে অবহিত করাবার। তাও ভাল ছিল, তার ওপর, তাহের এখন পশ্চাদ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে যে, প্রতিটি বক্তার স্থির অনুমান, সে ঐ ঘটনাগুলো সম্পর্কে ঘোর অবিশ্বাসী; তাই এটাও তাদের দায়িত্ব, তার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভঞ্জন করা। তাই তারা বক্তব্য শুরু করে চোখে আঙুল দিয়ে যে, দেখুন, এখানে এই হয়েছে, ওখানে ঐ ঘটেছিল। রাতের বেলায় যেমন, এখন তাহের হতাশ বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে না, তার ক্রোধ হয়, বল প্রয়োগ করে সে ক্রোধের উৎস নির্মূল করবার তীব্র ইচ্ছা হয়। টেবিলের ওপর সজোরে সে একটা ঘুসি মারে এবং নিজেই আহত হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে বিদীর্ণ হয়ে যায়। অচিরে পরাণ এসে হাজির হয়। তার মুখে অনাবিল হাসি। একটু আগে তাহের যে তার প্রতি ক্রোধযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করেছে, এখন তাকে দেখলে আদৌ তার অনুমান করা যাবে না। সে নিবেদন করে, যে, ইস্কুল প্রায় তারা পরিষ্কার করে এনেছে, আর মাত্র তিনটে কামরা বাকি; তাহের নিশ্চুপ অপেক্ষা করে; সে বুঝে গেছে যে অন্তত এটুকু সংবাদ দিতে পরাণ এখানে ছুটে আসবে না এবং ঙ-রকম প্রশস্ত হাসি ব্যয় করবে না। তার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। পরাণ জানায়, বাকি তিনটে ঘর আজকের ভেতরেই পরিষ্কার করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। তাহেরের কী মত ? সাপখোপের কথা পরাণ আরো একবার তোলে এবং অনুমতির জন্যে উজ্জ্বলতর হাসি বিস্তার করে সধৈর্য অপেক্ষা করে। সাপের ভয়ে তাহেরের কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি; সাপের কথা মনে করিয়ে দিতেই তার মন থেকে আক্রোশ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সেখানে আতঙ্কের উষা আবির্ভূত হয়। পরাণকে সে অবিলম্বে বলে, প্রস্তাবটি মন্দ নয় এবং জানতে চায়, এর দরুন তারা পারিশ্রমিক কী চাইবে। পরাণ এখানে আসবার আগেই সেটা শুনে এসেছে। বস্তুতপক্ষে, তাহেরের সন্দেহ হয়, পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা হয়ত ভোরবেলাতেই সে শুনে রেখেছে। জন-মজুর ডাকিয়ে গোটা ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলা যায় সহজেই। যে যার কাজে চলে যায়; পরাণ তার বাসায় যায়; তাহের ইস্কুলের খাতাপত্র নিয়ে বসে পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবার মানসে। বেলা ক্রমশ পড়ে যায়। পরাণের স্ত্রী আজ মাছের ঝোল করেছে; দেখতে লোভনীয় হলেও মুখে দিয়ে সে প্রতারিত বোধ করে; রঙটাই খুলেছে, স্বাদ কিছুমাত্র নয়। পেটে অর্ধেক খিদে রেখে সে আহার শেষ করে। রাতের মত পরাণ বিদায় নেয়। তাহের এই প্রথম অনুভব করে যে ইস্কুলেই বাস করবার সিদ্ধান্ত বোধহয় সঠিক হয় নাই। প্রথমত, সাপের ভয়, নিঃসঙ্গতাকে সে ভয় করে না; দ্বিতীয়ত, আহার সংক্রান্ত অসুবিধা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এখনো রাত বেশি হয় নাই। পরাণকে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ছায়া মূর্তির মতন পরাণ এসে দেখা দেয়। তার কাছে জানা যায় ঔষুধের দোকান এখনো খোলা আছে। তাহের তাকে বলে কার্বলিক এসিড নিয়ে আসতে; ছোটবেলায় বাবাকে সে দেখেছে, এই জলেশ্বরীতে থাকতে, ঘরের চারকোণে কার্বলিক এসিড রাখতে, রাখলে সাপ আসে না। ঔষধটি কতটা ফলপ্রসূ তা তার জানা নাই, তবু এ ছাড়া ভিন্ন কোনো অস্ত্রের কথা তার জানা নাই। পরাণ বিশেষ উৎসাহিত করে বলে মনে হয় না। বস্তুত সে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, ঔষুধের দোকান খোলা নাও থাকতে পারে; আসলে, আজকাল কোনো দোকানই সন্ধের পর খোলা থাকে না, সূর্য ডোবার আগেই যে যার ঘরে চলে যায়। তখন তাহের তাকে আরো একটা কাজ দেয়, যেন এই মুহূর্তে দ্বিতীয় একটি যুক্তি খাড়া না করলে পরাণকে পথে নামান যাবে না। তাহের একটা কাগজে ইস্কুল পরিষ্কার বাবদ খরচের পরিমাণ লিখে পরাণের হাতে দেয় এবং বলে, এমপি হাতের মোক্তারের কাছ থেকে দস্তখত নিয়ে আসতে যাতে পরদিন হাকিম সাহেবের পাল্টা দস্তখত নিয়ে টাকাটা অবিলম্বে তোলা যায়। জন-মজুর দু'জন ত আর টাকার জন্যে কাজের শেষেও অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। অত্যন্ত বিরস মুখে পরাণ রওয়ানা হয়। তাহের ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। আলমারিতে একটা পুরনো বই ছিল, পৃথিবীর মানচিত্র; অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বইয়ের অভাবে তাহের সেই মানচিত্রের পাতা ওলটাতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষে বিলেত যাবার প্রবল ইচ্ছে ছিল তার। মানচিত্রে যুক্তরাজ্যের পাতা খুলে সে দেখতে থাকে, কোথায় অক্সফোর্ড শহর, লন্ডন থেকে কতদূর সে শহর, কোনদিকে তার অবস্থান, সংকেত দেখে সে আবিষ্কার করতে থাকে যাবার ব্যবস্থা কী— রেলপথ, সড়ক, অনুমান করবার চেষ্টা করে লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড যেতে এতটা সময় লাগতে পারে। চোখ তুলে দেখে ক্যাপ্টেন তার সমুখে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ক্যাপ্টেন বিছানার ওপর বসে পড়ে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে, ম্যাপ দেখছিলেন বুঝি ? ক্ষণকালের বিহ্বলতা নিয়ে তাহের তার দিকে তাকিয়ে থাকে; কল্পনা না বাস্তব ঠাহর করতে পারে না। দুর্বল লণ্ঠনের আবিল আলোয় আগন্তুকের শরীরের চেয়ে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর বলে প্রতীয়মান হয়। প্রশস্ততর হাসি উপস্থিত করে ক্যাপ্টেন নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অচিরেই এ অনির্দিষ্টতার অবসান হয়। ক্যাপ্টেন জানায় যে চৌরাস্তায় পরাণের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তার কাছেই সে শোনে যে সে এখানে আছে; বস্তুত, কাল রাতে সে ইস্কুলের অফিস ঘরে আলো দেখেছিল এবং তখনি অনুমান করেছিল, তাহের এখানে বাসা করেছে। ক্যাপ্টেন আরো একবার প্রস্তাব করে, শহরে দু'একজন আছে যারা সানন্দে তাহেরকে আশ্রয় দেবে, শুধু বলার অপেক্ষা। ক্যাপ্টেন প্রত্যয় জ্ঞাপন করে যে, ইস্কুলে বাস করাটা কখনোই স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও ক্যাপ্টেন অধিককাল দাঁড়ায় না; 'থাকার অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন' বলে সে জানায় যে, পরাণকে হাফেজ মোক্তারের কাছে পাঠান আপাতত বৃথা, কারণ ব্যক্তিটি জলেশ্বরীতে নেই, ঢাকায় গেছে; অতএব, তাকে সে বাসায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহেরের প্রশ্নের জবাবে ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে; না হাফেজ মোক্তার কবে ফিরবে, তা জানা নাই। বরং সে জানতে চায়, তাহের চড়ুই পাখি দেখেছে কি না ? সকৌতুক তাহের সন্দেহ প্রকাশ করে যে, বঙ্গদেশীয় কেউ চড়ুই পাখি দেখে নি, এটা সত্য হলে ব্যক্তিটি হয় উন্মাদ অথবা অন্ধ বলেই সাব্যস্ত করতে হবে। ক্যাপ্টেন হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে চড়ুই পাখির তুলনা দেয় এবং বলে, যে, চড়ুই পাখি যেমন কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকে না, কেবলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়, হাফেজ মোক্তারও তেমনি অনবরত ঢাকা-জলেশ্বরী করে। ক্যাপ্টেন তাকে আশ্বাস দেয় ইস্কুল পরিষ্কার বাবদ দেনার জন্যে সে যেন চিন্তা না করে, হাফেজ মোক্তার দু'একদিনের মধ্যে ফিরে না এলে সে নিজেই এর ব্যবস্থা করে দেবে; আসলে পরাণকে সে বলে দিয়েছে মজুর দু'জন কাল যেন তার সঙ্গে একবার দেখা করে। 'একটু চা খাওয়া যাক' বলে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়। অকস্মাৎ তাহেরের চোখে পড়ে ক্যাপ্টেনের পিঠের ওপর এক খর্বাকৃতি কিমাকার আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলছে। অস্ত্রটি সে স্বাভাবিকভাবে টেবিলের ওপর, তাহেরের চোখের ওপর, নামিয়ে রাখে এবং বারান্দায় গিয়ে পরাণকে ডাকে। পরাণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় এবং সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘরের ভেতরে তাকায়। ক্যাপ্টেন তাকে দৌড়ে ইস্টিশান থেকে দু'গেলাশ গরম চা আনতে বলে দেয়; নির্দেশ কানে পৌঁছুবার আগেই পরাণকে দেখা যায় ইস্কুলের মাঠ প্রায় অর্ধেক পার হয়ে গেছে। তাহের পকেট থেকে পয়সা বের করবে ভেবেছিল, পকেটে সে হাতও দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন তাকে হাত তুলে নিরস্ত করে। চাওয়ালাকে তার নাম বললেই চা দিয়ে দেবে; ভাবনার কিছু নেই। মনের মধ্যে কোথায় একটা পীড়া অনুভব করে তাহের। বাইরে মাঠের ওপর অন্ধকারকে সঞ্চরণশীল মনে হয়, ভয়াবহ কোনো বিশাল প্রাণীর কুব্জপৃষ্ঠের মত ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তল হয়ে ওঠে সে অন্ধকার, গাঢ় পেশিবল প্রয়োগ সম্প্রসারিত হতে থাকে। ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল শিখায় লণ্ঠন জ্বলতে থাকলেও, অবিলম্বে তার আলো আক্রান্ত হয় সেই অন্ধকার দ্বারা, ঘরটিতে অতিশয় খিন্ন দেখা যায়। স্মিতমুখে ক্যাপ্টেন উচ্চারণের পাড় ঘেঁসে নীরবে তাকে, তাহেরকে, নিরীক্ষণ করে চলে। মনে হয়, কোথাও কোনো একটা চাকা ঘুরিয়ে কেউ এক সুদীর্ঘ রশি গুটিয়ে তুলছে, চরাচরের ওপর দিয়ে সেই রশি অবিরাম প্রায়-অশ্রুত হিসহিস ধ্বনি তুলে চলমান। অকস্মাৎ তাহের নিজেকে ক্যাপ্টেনের করতলগত বলে বোধ করতে থাকে। এক প্রকার ভয় হয় তার, এক প্রকার তৃষ্ণায় তার জিহ্বা ক্রমশ শুকিয়ে আসতে থাকে। অবসন্ন চোখে সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহেরকে অদৃশ্য একটা পাটাতনের সঙ্গে বিদ্ধ করে রাখে। ক্যাপ্টেন তাকে কিছু বলছে না কেন ? অথবা, আচমকা এভাবে তার উপস্থিত হবার পেছনে লুকিয়ে আছে কোন উদ্দেশ্য ? ভয়ের সঙ্গে অস্বস্তির সমপাতনে অভূতপূর্ব উদ্বেগের জন্ম হয় এখন। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, এমনকি কোনো শব্দ উচ্চারণ করে এই ভয়াবহ সম্মোহন ভঙ্গ করাটাও সুবিচেনা সম্পন্ন বলে তার বোধহয় না। তাহের স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে; বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি তাল সে নিজেরই ইচ্ছারই বিরুদ্ধে বলপূর্বক শুনতে থাকে। আপন শরীরের ওপর দিয়ে সে সেই রশির সঞ্চালন অনুভব করে। এই তরুণের শক্তির উৎস কি ঐ কিমাকার আগ্নেয়াস্ত্র, যা এখন তার ও তরুণের মধ্যবর্তী টেবিলে অলস এবং অহিংসভাবে স্থাপিত ? চোখ ফিরিয়ে অস্ত্রটিকে সরাসরি দেখবার প্রবল বাসনা হওয়া সত্ত্বেও তাহের বিরত থাকে; সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করে সে তীব্রভাবে। অস্ত্র সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া মাত্র সে অনুভব করে তার দৃষ্টির যে সীমানা তারই পাড় ঘেঁসে অস্ত্রটি শায়িত। দৃষ্টি না ফিরিয়ে, কেবল মন সন্নিবেশিত করলেই টের পাওয়া যায় অস্ত্রটির উপস্থিতি; ঝাপসা, টেবিলের রঙের সঙ্গে প্রায় বিলীয়মান। অস্ত্র, নির্মম রকমে নিরপেক্ষ, নির্বিচার, নির্বিকার। বস্তুত, পদার্থ বিদ্যায় বর্ণিত জলের ধর্মের সঙ্গে তার কোনো ভেদ নাই। জল যেমন যখন যে পাত্রে অবস্থান করে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে; অস্ত্রও তেমনি, যখন যার হাতে থাকে তারই তৃতীয় হাতে সে পরিণত হয়। অতিরিক্ত, অধিকারীর চিত্তে পরিবর্তনশীলতাও অস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ আরোপিত হয় অনিবার্যভাবে। মানুষ বিবর্তন মাধ্যমে পরিহার করেছে তার দেহজ অস্ত্রসমূহ; দংষ্ট্রা, নখর, বলীয়ান পেশি; বিকল্প উদ্ভাবন করেছে দেহাতিরিক্ত অস্ত্রসমূহ; কিরীচ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক। যেহেতু নবলব্ধ এই অস্ত্র দেহাতিরিক্ত তাই প্রতিপক্ষের অস্ত্রসম্পদ সম্পর্কে মানুষের এত অনিশ্চয়তা, পরিণামে ভীতিবোধ। আসলে উভয়পক্ষে সমান সমান অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিচলিত বোধ করে; কারণ অস্ত্রের একই সঙ্গে চাই অস্ত্রনিক্ষেপের চাতুর্য এবং চাতুর্য এমনই এক গুণ; পরীক্ষাতেই যার পরিচয় এবং অস্ত্র ব্যবহার ক্ষেত্রে পরীক্ষার অবকাশ নাই; ব্যবহারের কৌশলে তারতম্য ঘটার অর্থ একপক্ষের পতন তথা মৃত্যু। আর তাই সৈনিকের পেশা পৃথিবীতে সর্বাধিক উৎকর্ষ দাবি করে; সৈনিক নির্ভর করে যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে আপন অনুমান শক্তির ওপর সবচেয়ে অধিক মাত্রায়। সৈনিকের শিক্ষা অন্য যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক বাস্তবর্জিত এই অর্থে যে, প্রস্তুতি পর্বে যে শত্রু সৃষ্টি করে সে দক্ষতা অর্জন করে তা নিতান্তই কল্পনানির্ভর। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, সে নিরস্ত্র, এবং অন্যপক্ষ সশস্ত্র, দু'য়ের ভেতরে ব্যবধান মৃত্যুর মতই দুস্তর ও অপরিবর্তনীয়। তাহলে, টেবিলে শায়িত ঐ অস্ত্রের কারণেই সে, তাহের নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ক্যাপ্টেনের কাছে বিক্রিত বলে বোধ করছে ? সম্ভাবনাটি উদিত হওয়ামাত্র তাহের প্রবলভাবে তা অস্বীকার করে। আসলে, অস্ত্রে ভীত হওয়াটা সর্বাধিক অগৌরবজনক বলে তার কাছে প্রতিভাত হয়। তার ভেতরে এক প্রকার অহম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে অহঙ্কার, তার অস্তিত্বের অহঙ্কার, তার বিদ্যার অহঙ্কার, তার অভিজ্ঞতার অহঙ্কার। এবং ঐ অহঙ্কারবোধ তাকে দু'পায়ের ওপর আপাতত দাঁড় করিয়ে রাখে; কিন্তু বিপজ্জনক সে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রতি মুহূর্তে আশংকা হয় এই বুঝি সে পড়ে যাবে। পরাণ চা নিয়ে আসে। ময়লা কেতলিটা সে সন্তর্পণে টেবিলের কোণায় রাখে, তারপর ডান হাতে কৌশলে একত্রে ধরা দু'টি খর্বাকৃতি গেলাশ টেবিলে নামিয়ে চা ঢালে, তারপর কেতলিটা আবার টেবিলে রেখে ডান হাতে একটা গেলাশ নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করে প্রথমে চা এগিয়ে দেয় ক্যাপ্টেনকে, তারপর একই মুদ্রায় পরবর্তী গেলাশ তাহেরের সামনে সে বাড়িয়ে দেয়, চা দিয়ে আবার একই প্রকার সাবধানতার সঙ্গে সে কেতলিটা তুলে নেয়, যেন ভয়াবহ একটা বোমা সে নাড়াচাড়া করছে, কয়েক পা পিছিয়ে যায় এবং ভয়ার্ত চঞ্চল চোখে ক্যাপ্টেনকে দেখতে থাকে। ক্যাপ্টেন তাকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে। যে প্রশ্নটি মনের মধ্যে দু'দিন থেকে অবিরাম চঞ্চল হয়েছিল, তাহের এখন তাকে মুক্তি দেয়। বিনা ভূমিকায় সে আজমীর-পিপাসুর কথা তোলে এবং জানতে চায়, সেদিন রাতে ভাত খাবার হোটেল থেকে তাকে নিয়ে যাবার পর তার পরিণতি কী হলো ? ক্যাপ্টেন তাহেরের একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়, সুপ্রচুর ধোঁয়া ছাড়ে, এই বিশেষ সিগারেট ব্র্যান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রশংসা করে, এবং জানায় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে সে আরো জানায়, হত্যা বন্দুকের গুলিতে সমাধা করা হয়। কেন নয় ?— টেবিলের ওপর চাপড় মেরে ক্যাপ্টেন জানতে চায় সে কি খারাপ লোক ছিল না ? সে কি মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যায় নি ? লোক চিনিয়ে দেয় নি ? সে কি একদল মুক্তিযোদ্ধাকে কপট দেশপ্রেমে আশ্বস্ত করে তাদের আশ্রয় দিয়ে পরে ধরিয়ে দেয় নি ? 'আমার চারজন সেরা ছেলের নির্মম মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী'— এই কথা বলে ক্যাপ্টেন দীর্ঘ সময়ের জন্যে নীরব হয়ে যায়। হয়ত, এখন তার মনে পড়ে যায় সেই ছেলেদের মুখ, তাদের নাম, তাদের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের দৃশ্য। মাথা নামিয়ে, হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে সে মেঝের কোণের দিকে শূন্য এবং একই সঙ্গে জ্বলন্ত চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। টেবিলের ওপর গেলাশে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চায়ের তৃষ্ণা আর সে বোধ করে না; হাতে সিগারেট পুড়তে থাকে, তামাকের আকর্ষণ আর তাকে আকৃষ্ট করে না। সেই হোটেলে সেদিন রাতে তাহের সত্যসত্যই গুলির শব্দ শুনেছিল, সে শব্দ তার শ্রুতিবিভ্রম নয়। এবং সে শব্দ হোটেলের সকলেই শুনতে পেয়েছিল এবং সকলেই বুঝতে পেরেছিল, ঘটনার পূর্বাপর কী; হোটেলের মালিক নিশ্চিত জেনেও তাকে মিথ্যে বলেছে, শব্দটা বাঁশঝোপে কোনো বাঁশের নুয়ে পড়বার আওয়াজ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এসব কিছুতেই প্রমাণ হয়, এই তরুণকে জলেশ্বরীর সকলেই কতটা ভয় করে, তার সম্পর্কে কোনো কিছুই তারা জানতে চায় না, এবং সেই না জানান কেবল, সে বিদেশী বা নবাগত, তার পক্ষেই প্রযোজ্য, এটাও তাহেরের মনে হয়। সে একই সঙ্গে এই জনপদ এবং এর অধিবাসীদের থেকে অনিচ্ছুক রকমে বিচ্ছিন্ন এবং নতুন করে ভয়ার্ত বোধ করে। সম্ভবত তাকে নীরব থাকতে দেখেই ক্যাপ্টেন বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়, তার কণ্ঠস্বর সশব্দে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে সে জানায়, বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই। ক্যাপ্টেন উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের তেজ পরীক্ষা করে, একবার কমায় একবার বাড়ায়, তারপর শিখাটি পূর্বাবস্থায় রেখে সে আসন গ্রহণ করে। অলস প্রশান্ত কণ্ঠে সে বলতে থাকে যে, নির্বিচার হত্যায় সে বিশ্বাসী নয়। অপরাধীর অপরাধ যত বড়ই হোক, সে তাকে নিজ বক্তব্য জানাবার সুযোগ সব সময়ই দিয়েছে; আর, অপরাধের দণ্ড কী হবে, তাও সে একা নির্ধারণ করে না, সে এবং আরো দু'জন দণ্ড সম্পর্কে একমত হলেই শুধু দণ্ড দেয়া হয় এবং তা সমাধা করা হয়; দণ্ড সমাধা করা হয় তিনজন মিলে। ক্যাপ্টেন জানায়, পরশু রাতে আজমীর-পিপাসুকে আবিষ্কার করবার পর তাকে শহীদ মিনারে নিয়ে যায়; বিচার সাধারণত সেখানেই সম্পন্ন করা হয়। অবিলম্বে অপর দুই বিচারককে সংবাদ পাঠান হয়; তারা সরকারি খাদ্য গুদাম পাহারায় রত ছিল তখন; তারা আসে এবং বিচার বসে। আজমীর-পিপাসুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বিস্তারিত আবৃত্তি করা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় সে সম্পর্কে তার বক্তব্য কী? প্রথমত সে নীরব থাকে, পরে, প্রতিটি অভিযোগ সে নিজেই স্বীকার করে নেয় এবং প্রাণভিক্ষা চায়। তাকে জানান হয়, প্রাণভিক্ষার সুযোগ তাকে এর আগে দেয়া হয়েছিল, যখন মিলিটারিকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছিল; তখন তার কাছে খবর পাঠান হয় যে এখনো সে যদি বিরত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু তখন সে ঐ প্রস্তাব উপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট হয় নাই, সংবাদ বাহককে সে মিলিটারির হাতে তুলে দেয়। আজমীর-পিপাসু তখন বিচারক প্রত্যেকের পা ধরে নিবেদন করে যে, আল্লার কাছেও ক্ষমা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আল্লার বান্দার কাছে সে কেন ক্ষমা পাবে না? এ কথা সে স্মরণ করায় যে, তাকে ক্ষমা করা হলে রাতের এই অন্ধকারেই সে জলেশ্বরী ত্যাগ করে চলে যাবে, আর কোনোদিন এ মুখো হবে না, তারা বরং তার যাবতীয় যা সহায় সম্পত্তি আছে নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করে নিতে পারবে, এমন কি বললে সে এখনি দলিলের কাগজে লিখে সম্পূর্ণ স্বত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন তাকে জানায় যে, সম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ তাদের নাই, বস্তুতপক্ষে কেউ বলতে পারবে না যে তার সম্পত্তি তারা আত্মসাৎ করেছে, এ কথা বলে সে তাদের অপমানই করছে; দ্বিতীয়ত, জলেশ্বরী ত্যাগ করে চলে যাবার প্রস্তাবটি আসলে হেত্বাভাষ, কারণ আজমীর-পিপাসু ধৃত হবার আগেই পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দাড়ি গোঁফের আড়ালে গুপ্ত থাকবার কৌশল অবলম্বন করেছিল, অতএব, এ প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য; তৃতীয়ত, তার প্রথম বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর, আল্লা ক্ষমা করলেও তারা ক্ষমা করতে নিতান্তই অপারগ কারণ তারা আল্লা নয়, তাছাড়া, আল্লার সঙ্গে মানুষের তুলনা করাটা তাদের বিশ্বাস অনুসারে মহাপাপ বলে বিবেচ্য হবে। অতঃপর তার অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড, এই রায় তাকে শোনান হয়। রায় শোনার পর সে আর উচ্চবাচ্য করে না; চারদিক এবার তাকিয়ে দেখে শুধু সম্ভবত ইহলোক ত্যাগ করবার মুহূর্তে পরিচিত দৃশ্যাবলী সে শেষবারের মত দেখে নিতে চায়, কিন্তু রাতটা অন্ধকার ছিল বলে, সে আশা বিশেষ পূর্ণ হয় না। ক্যাপ্টেন মন্তব্য করে, যে, এই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সে এর আগেও লক্ষ করেছে অন্যান্য যাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে তাহের ভেতরে; প্রতিবারই সে একপ্রকার বিস্ময় এবং ক্ষণস্থায়ী করুণা বোধ না করে পারে নাই। আজমীর-পিপাসুকে মিনারের অদূরে একটা জিগা গাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধা হয় এবং সে ও অপর দুই বিচারক একসঙ্গে গুলিবর্ষণ করে প্রাণদণ্ড সমাধা করে। তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে— এই শেষ তথ্যটি জানিয়ে গেলাশের অবশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঠাণ্ডা চা ক্যাপ্টেন এক চুমুকে নিঃশেষ করে উৎসুক চোখে তাহেরের দিকে তাকায়। দৃষ্টির সে বিশেষ বিভাসটি তাহেরের অবিলম্বে স্পষ্ট হয় না। অখণ্ড এক নীরবতা প্রশস্ত দুই ডানা মেলে ইস্কুলের আপিস ঘরটি অধিকার করে নেয়। পরাণ উঁকি দেয়, সন্তর্পণে দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে এবং চোখের নিমিষে খালি গেলাশ ও কেতলি নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন তাহেরকে আরো একবার বলে যে, ইস্কুল ঘরেই বাসা করবার সিদ্ধান্তটি মোটেই ভাল হয় নি; তার এখনো বিশ্বাস যে, তাহের এভাবে থাকতে পারবে না, অবশ্য সে যদি জলেশ্বরীতে স্থায়ীভাবে বাস করবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে, তাহলে তার বলবার কিছু নেই। তাহের প্রতিবাদ করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। 'তাহলে বাসা আপনাকে একটা নিতেই হবে'— ক্যাপ্টেন এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করে আবার নীরব হয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, বাসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আসলে সে এখনো পরশু রাতের সেই বিচার ও প্রাণদণ্ড দানের ভেতরেই ভ্রমণ করছে। এই অনুমানের সত্যতা অবিলম্বে প্রমাণিত হয়। ক্যাপ্টেন জানতে চায়, তাহের কি আজমীর-পিপাসুকে প্রাণদণ্ড দানের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে ? যদি তার কোনো প্রকার বক্তব্য থাকে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় জানাতে পারে। বস্তুত, ক্যাপ্টেন প্রত্যয় প্রকাশ করে যে, তাহের ব্যাপারটি আদৌ অনুমোদন করে নাই। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল আগের ঔৎসুক্য সহসা আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয়, যেন তাহেরের অনুমোদন প্রকাশের ওপর তার সমস্ত অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক রকমে নির্ভর করছে। তাহের বিস্মিতবোধ না করে পারে না। তার অনুমোদন এই তরুণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কীসে ? নাকি, এ তার, তাহেরের চিত্তবিভ্রম ? সে গভীর সন্ধানী চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায় এবং দেখে, তখনো সে একই প্রকার আশঙ্কায় দোদুল্যমান। অবিলম্বে তাহের একপ্রকার শক্তি অনুভব করে, দৈহিকভাবে অনুভব করে, ক্যাপ্টেনের কাছে কিছুকাল আগে যে সে নিজেকে বিক্রিত বোধ করছিল, এখন মনে হয়, মূল্যশোধ করে সে মুক্ত হয়ে উঠছে। দীর্ঘকাল বন্দি থাকবার পর হাতের শেকল খুলে নিলেও তার উপস্থিতির অনুভব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায় না, তাহেরও এখন সেই প্রকার বোধ করে, সে এমনকি দু'হাতের আঙুল দিয়ে নিজের কবজি ঘষে, সেই অদৃশ্য শেকলের অনুভব ক্রমাগত মুছতে থাকে, তারপর টেবিলের ওপর রাখা অস্ত্রটি ঠেলে একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের চোখে আশঙ্কার ছায়া গভীরতর হয়। ক্যাপ্টেন দৃষ্টি দিয়ে পদচারণারত তাহেরকে অনুসরণ করতে থাকে। তাহের বলে, না, সে হত্যায় বিশ্বাস করে না। মৃত্যু দ্বারা মানুষের পতন-সম্ভাবতা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায় না। অপরাধীর মৃত্যুতে অপরাধের উৎস নিষ্ফলা করে দেয়া যায় না। আদিম সমাজে, গোষ্ঠী এবং গ্রামের বাইরে যখন জগতের অস্তিত্ব ছিল না, তখন হয়ত হত্যার মাধ্যমে অপরাধের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব ছিল, বস্তুতপক্ষে, প্রাণের বদলে প্রাণ— এই ধারণার জন্ম হয় বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র সমাজে, বর্তমানে সহস্র গ্রাম এবং কোটি মানুষ, এবং তাও বহির্বিশ্ব থেকে কোনো প্রকারেই বিচ্ছিন্ন নয়, এমতাবস্থায় এ নীতি নিতান্তই অচল এবং শুধু তাই নয়, এ নীতি যারা অনুসরণ করে তারা নিজেরাই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। তাহলে 'আপনি কিছুই দেখেন নি' বলে ক্যাপ্টেন সবিক্ষোভে উঠে দাঁড়ায়, প্রতিবর্তীক্রিয়াসুলভ ভঙ্গিতে টেবিলে রাখা অস্ত্র তুলে নিয়ে কাঁধের সঙ্গে ঝোলায়, বিদায় নেবার প্রস্তুতির মত তা মনে হলেও ক্যাপ্টেন বিদায় নেয় না, বরং তাহেরের বিছানার ওপর দৃঢ় আসন নিয়ে বসে এবং জানতে চায়, তাহের মুক্তিযুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চলাকালে কোথায় ছিল ? কতটুকু সে দেখেছে ? উদ্যত অস্ত্রের সমুখে স্তোত্রপাঠ কি মূর্খেরই স্বভাব নয় ? অত্যাচারের চাবুক হাত দিয়ে ছিনিয়ে নেয়ার বদলে, সে হাত প্রার্থনায় যুক্ত রাখাটা কি কাপুরুষতা নয় ? ক্যাপ্টেন শহর ও মফস্বলের ভেতরে তুলনামূলক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে। এ কথা সত্য যে, শত্রুপক্ষ শহরেই আক্রমণ শুরু করে প্রথমে; পাশাপাশি এটাও সত্য যে, শহরেই প্রথম শত্রুপক্ষ ফিরিয়ে আনে এক স্বাভাবিকতা, যা কৃত্রিম; কারণ, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি শহর ভিন্ন গ্রামে ধাবিত হয় না। অতএব, শত্রুপক্ষ শহরে অত্যাচার কমিয়ে, স্বাভাবিকতার মুখোশ পরিয়ে, গ্রামে গ্রামান্তরে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। 'আমি জীবনে কখনো অস্ত্র ধরি নি'— ক্যাপ্টেন এ কথা বলে কাঁধের অস্ত্র আবার টেবিলে রাখে। কিন্তু সেই তাকে অস্ত্র ধরতে হয়েছে, অস্ত্রচালনা শিক্ষা করতে হয়েছে; কারণ, সশস্ত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা চলে একমাত্র সশস্ত্র হয়েই; বিদেশীর সঙ্গে যেমন বাক্যালাপ করা চলে একমাত্র তার ভাষা আয়ত্ত করেই, আর কোনো পন্থায় নয়। ক্যাপ্টেন হঠাৎ কোমল হয়ে যায়। তার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে আসে, হয়ত চোখের পাতায় সিক্ততার আভাস পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন বলে, সেই চারজন মুক্তিযোদ্ধা, যাদের ধরিয়ে দেয় ঐ আজমীর-পিপাসু এবং পরে যাদের মিলিটারি হত্যা করে এই স্কুল বাড়িতে এনে, তাহের কি জানে, দেশ স্বাধীন হবার পর, তাদের মায়েরা ক্যাপ্টেনকে যখন বলেছিলেন, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে, তখন যে অসহায়বোধ চেতনাকে, অস্তিত্বকে অবসন্ন করে দিয়েছিল তার অণুমাত্র কার হৃদয়ে সংক্রমিত হলে সে নীরব থাকতে পারে না। সে জানে, মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্তু মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব ? ঘটনা যখন অরণ্যের রীতিতে ঘটে তখন সেই এক রীতিতে তার উপসংহার টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামের এ এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক লহমায় অশুভ শক্তিসমূহ অন্তর্হিত হয় নি; এখনো অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে। বাঙালির সবচেয়ে বড় দোষ কী জানেন ? ক্যাপ্টেন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়— উদারতা এবং নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস; সে বিজ্ঞাপন হচ্ছে, বাঙালি কবি চিত্তের অধিকারী, কোমলপ্রাণ, প্রশস্তবক্ষ। তরুণ জানতে চায়, বাঙালি ভিন্ন কীসে ? কোন জাতি কবিপ্রাণ নয়, বলতে পারেন ? এমনকি, মানুষখেকো অরণ্যবাসী মানুষেরও আছে লোকজ গান আর কবিতার ঐতিহ্য; তাদের কোনো কোনো উদাহরণ পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম। তাছাড়া, মানুষ মাত্রেই প্রকৃতির প্রতিটি বর্ণবদলে দুলে ওঠে, প্রতিটি মর্মর তোলে প্রতিধ্বনি। শুধু মানুষ কেন, যে-কোনো প্রাণীর বেলাতেও তা সত্য; পূর্ণিমা রাতে, বাড়ির পেছনে পরিত্যক্ত অঙ্গনে এমন কুকুর আপনিও দেখেছেন, যে সমুখের দুই থাবা তুলে সুগোল চাঁদ ধরবার ব্যর্থতায় চাপা আর্তনাদ করে উঠেছে। না, বাঙালির কবিপ্রাণতা দ্বিতীয়বিহীন কোনো লক্ষণ নয়। অথচ কোনো প্রকারে এই মিথ্যাটিই বাঙালির সবচেয়ে বড় গৌরবের প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর, আসুন বাঙালির হৃদয় কোমল এবং উদার, এই প্রসঙ্গে। আপনি কি দেখেন নি, পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অসংখ্যবার দুই ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ? আপনি কি দেখেন নি, বাঙালি পিতা তার সন্তানকে শাস্তি দিতে গিয়ে সারাদিন ভাঁড়ার ঘরে আটকে রেখেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিকল বন্ধ করে ? আপনি জানেন না, বাংলা কোনো ছবিই সফল নয়, যদি সে ছবিতে না থাকে কোনো বালকের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করবার, তাকে প্রহার করবার দৃশ্য ? আপনি বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। কোথায় কবে কাকে ক্ষমা করেছে বাঙালি ? যাকে আপনি ক্ষমা বলবেন, আসলে তা দুর্বলতা। বাঙালি যদি শত্রুকে কখনো ক্ষমা করে থাকে তো, বলতে হবে, প্রতিশোধ নেবার মত যোগ্যতা বা শক্তি ছিল না বলেই অন্য প্রকার জিৎ-এর সন্ধানে সে ক্ষমার কথা উচ্চারণ করেছে। আর এতেই প্রমাণিত হয়, বাঙালি কতটা চতুর যে নিজের দুর্বলতাকেও সে মহৎ পোশাকে সজ্জিত করতে সক্ষম। আসলে, বাঙালি চরিত্রের যদি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে তো তা হচ্ছে, বিজ্ঞাপনে আস্থা। তাই বাংলাদেশে যেমন যৌনদুর্বলতার প্রতিষেধক, শূলব্যথার ঔষধ বিক্রি হয় লক্ষ লক্ষ টাকার, তেমনি বাঙালি কবি, বাঙালি কোমলপ্রাণ, তথা বাঙালি মানবকুলে মহৎ গোষ্ঠী, খয়ের-গোলা পানির মত এই সালসাটিরও অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে উপদংশের মত প্রাণঘাতী এই মিথ্যার চিকিৎসা এখন সবচেয়ে আশু প্রয়োজন, এবং তার সময় এখনই। ক্যাপ্টেনের বক্তব্যের সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না তাহের এমনকি অনুমোদনও করতে পারে না, বস্তুত, সে তার কথার প্রবাহে ছিন্নমূল তৃণের মত আবর্তিত হয়ে তলিয়ে যায়। অচিরে একটা গুরুগুরু ধ্বনি ওঠে; সে ধ্বনির উৎস সহসা বোঝা যায় না। বহুদূরে বৈশাখের মেঘের মত চাপা একটা গর্জন ক্রমশ নিকটতর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন এবং তাহের, দু'জনেই একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে শোনে সে স্থিরলক্ষে অগ্রসরমান ধ্বনি, এবং দু'জনেই প্রায় একই সঙ্গে উপলব্ধি করে যে, জলেশ্বরীতে রাতের ট্রেন আসছে। ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আগেকার সমস্ত চিন্তা অভিব্যক্তি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় তার চেহারা থেকে, তার চিত্ত থেকে। কেমন একটা ব্যাকুলতা তাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। এক ধরনের অনিশ্চয়তা তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে থাকে। 'ঢাকা থেকে আমার স্ত্রীর আসবার কথা'— এই কথা বলে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়। তাহেরের প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, তার স্ত্রী ঢাকায় থাকে, আজ সকালেই টেলিগ্রাম পেয়েছে, সে আসছে; আসলে সে ইস্টিশনে যাবে বলেই এদিকে এসেছিল, সময় ছিল বলে তাহেরের সঙ্গে দেখা করে যায়। ক্যাপ্টেনকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখায়। সে দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ কী তাহের বুঝে উঠতে পারে না; হঠাৎ তার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তাহের। আসলে সে ধারণা করতে পারে নি যে ক্যাপ্টেন বিবাহিত; তার স্ত্রী কেন ঢাকায় থাকে তাও তার হৃদয়ঙ্গম হয় না; তার এক প্রকার সন্দেহ হয়, ক্যাপ্টেনকে যদিও জলেশ্বরীতে স্থায়ী বাসিন্দা বলে মনে হয়েছে তার, আসলে সে হয়ত তা নয়। তাহের এক প্রকার নিশ্চিত হয়, যে, এই তরুণের অনেক কিছুই তার জানা নেই। সে প্রবলতর আকর্ষণ বোধ করতে থাকে ক্যাপ্টেনের প্রতি। তাহের বলে, তার যদি আপত্তি না থাকে ইস্টিশনে সেও যেতে চায়। ক্যাপ্টেন হাত তুলে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে। তাহের তবু নিরুৎসাহ হয় না। এক্ষুণি তার ঘুম আসবে না, হাতেও কোনো কাজ নেই, অতএব ইস্টিশনে একবার বেড়িয়ে এলে মন্দ হতো না, এই যুক্তি উপস্থাপিত সে করে ক্যাপ্টেনের সম্মতির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে। ক্যাপ্টেন আরো একবার মাথা নাড়ে। তখন তাহের নিজের প্রতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইস্টিশনে যাবার জন্যেও কি এই তরুণের অনুমতি আবশ্যক ? সে কি স্বাধীন সিদ্ধান্তে বেরুতে পারে না ? তাকে জিজ্ঞেস করবারই বা কী প্রয়োজন ছিল ? অথচ, একবার যখন সম্মতি প্রার্থনা করেছে, তখন বিনা অনুমোদনে সে বেরোয় বা কী করে ? ক্যাপ্টেন তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেখে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। দূরে ট্রেনের হুইসিল শোনা যায়; রাতের অন্ধকারে এবং চিত্তের অনিশ্চয়তা চিরে সে হুইসিল অনিবার্য পরিণতির মত এগিয়ে আসে এবং প্রায় বুকের ওপর প্রবল ঘন নিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইস্টিশান এখান থেকে মাত্র দু'মিনিটের পথ। তাহের কল্পনা করতে থাকে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে। কেমন সে দেখতে? সন্তান আছে? কতদিন বিয়ে হয়েছে? সে যদি ঢাকায় তো ক্যাপ্টেন কেন জলেশ্বরীতে? কতদিন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন? টেলিগ্রাম করে হঠাৎ আসবার কারণই বা কী? মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না এই দুর্বিনীত প্রশ্নগুলো। তার নিজের স্ত্রীর কথা আভাস একবার মনে পড়ে যায়। বিয়ের পর থেকে কোনোদিন তারা আলাদা হয় নি, একটি দিনের জন্যেও তারা একজন আরেকজনকে ফেলে কোথাও থাকে নি। তাহেরের শ্বশুরবাড়ি ঢাকাতেই, তাই সেখানে যাবার হলে দু'জনে এক সঙ্গেই গিয়েছে। একবার একমাস সে ছিল শ্বশুর বাড়িতে; সেখানে থেকেই সে ইস্কুল করতে যেত। একদিনের কথা মনে পড়ে যায় তার। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ভুল করে সে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল, বাড়িতে পৌঁছেই তার স্মরণ হয়, স্ত্রী বাপের বাড়িতে এবং সেও সেখানে অতিথি। মনে পড়ে, তালা খুলে ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ এক শূন্যতাজড়িত উদ্বেগ তাকে আক্রমণ করেছিল, সে আক্রমণে এতটাই পরাস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। হাসনাকে এ কথা বলতেই সে হেসে উঠেছিল; বড় নির্মম মনে হয়েছিল তার সেই হাসি, খণ্ড খণ্ড কাচের ওপর দিয়ে প্রবল জলধারা বয়ে যাবার মত ভঙ্গুর হাসি। সেই শূন্যতা, সেই উদ্বেগ কি ক্যাপ্টেন কখনো বোধ করে নাই? কিংবা তার স্ত্রী? কীভাবে তারা গ্রহণ করেছে এই বিচ্ছেদ? এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্লাটফরমে, এতক্ষণে তারা হয়ত বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। কোথায় ক্যাপ্টেনের বাড়ি? শহরের ভেতর? শহরের বাইরে? আজ রাতেও কি ক্যাপ্টেন বেরুবে তার প্রতিরাতের পাহারায়? আজ রাতেও কি দূর অন্ধকারের ভেতর শোনা যাবে ক্যাপ্টেনের সঙ্কেত ধ্বনি; এ-এ-রে-এ-এ? ধ্বনিটা সে সারারাতে একবারও শুনতে পেয়েছিল কিনা, স্মরণ হয় না; ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এসেছে কি না, সারাদিনে তাও জানা যায় না। জন-মজুর দু'জন বিকেলের মধ্যেই ইস্কুলের পেছনে জংলা জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলে, সেখানে একটা ডোবা উদ্‌ঘাটিত হয়, কিন্তু সাপের কোনো বাসার চিহ্ন দেখা যায় না। পরাণ কার্বলিক এসিড এনে আপিস ঘরের চারকোণে রেখে দেয়। জন-মজুর দু'জন হাত পেতে পয়সার জন্যে অপেক্ষা করে, তাহেরের কাছে দেবার মত আর অর্থ নেই, তাদের সে অনুরোধ করে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা, কাল ইস্কুল খুলবে, দুপুরের দিকে তারা যদি আসে তাহলে অবশ্যই বাকি মজুরি তারা পেয়ে যাবে। বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে তারা সংসারের দুরারোগ্য অভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে, তাহেরকে মনোযোগ দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তা শুনতে হয়, কারণ, মজুরি না দিতে পেরে যে সংকোচ সে বোধ করে তা মনোযোগ দিয়ে লঘু করা সহজতর হয় তার পক্ষে। অবিলম্বে সে হাকিম সাহেবের উদ্দেশে বেরোয়। সম্ভব কাছারিতে তাকে এখন পাওয়া যাবে। হাফেজ মোক্তার ঢাকায়, তার অনুপস্থিতিতে ব্যয় সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত একটা পথ হাকিম সাহেব অবশ্যই করে দিতে পারবেন। ক্যাপ্টেন যদিও বলেছিল, অসুবিধা হলে তাকে খবর দিতে, তাহের সে প্রেরণা বড় একটা বোধ করে না। বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের প্রতি সে একই সঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বোধ করতে থাকে; ক্যাপ্টেনের সঙ্গে প্রতি সাক্ষাতেই এক প্রকার রহস্যময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনিশ্চয়তা গাঢ়তর হতে থাকে তার চিত্তে। কাছারিতে হাকিম সাহেবকে পাওয়া যায় না। কেউ বলে, তিনি মফস্বলে গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নাই। কেউ তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়ারই আবশ্যকতা বোধ করে না। তাহের অনুভব করে প্রতিটি মানুষ অতি সাধারণ নিষ্পাপ যে কোনো প্রশ্নের সাক্ষাতেই কেমন সংকুচিত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্তে একটা কাঠিন্য এসে চেপে ধরে, মানুষগুলো শামুকের মত গুটিয়ে যায়। যে-কোনো প্রশ্নই তারা ঘোরতর সন্দেহের সঙ্গে শ্রবণ করে এবং শীতলতম উপেক্ষার সঙ্গে নীরব থাকে। কাছারির আঙিনায় প্রচণ্ড হট্টগোল আর অনবরত চলাচলের ভেতরে তাহের নিজের নীরবতা এবং ধৈর্য আরো প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে থাকে। সারা বিকেল উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার পর বাজারের মসজিদে মোয়াজ্জিনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ লাল হয়ে যায়; অনতিপরে ঘোর সন্ধ্যার আক্রমণে দিনের অপমৃত্যু হয়; নিরুত্তেজ হ্যাজাকের আলোয় দু'একটা দোকানের অভ্যন্তর আংশিক দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র, বাকি দোকানগুলো কোনো এক নীরব সংকেতধ্বনি শুনে ঝটপট বন্ধ হয়ে যায়; অচিরে এবং বলীয়ান স্তব্ধতা একই সঙ্গে জলেশ্বরীতে নেমে পড়ে। আজ রাতের ভেতরেই টাকা তাকে সংগ্রহ করতে হবে। কাল দশটায় ইস্কুল খুলবে। শিক্ষক বিনা একা সে কী করে গোটা দিনটা সামলাবে, সেটাও একটা প্রধান উদ্বেগ হয়ে তাকে দংশন করতে থাকে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধও তাকে রেহাই দেয় না। হাকিম সাহেবের কুঠিতে বারান্দার বেঞ্চে তাহের অপেক্ষা করে; তার চতুপার্শ্ব থেকে শুরু করে সমুখে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার ক্রমশ পুরু হয়ে ওঠে। তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে নানা প্রকার শব্দ উঠতে থাকে, পায়ের শব্দ, গরুর গাড়ির শব্দ, গাছের ভেতরে বাতাসের দৌরাত্মের শব্দ এবং নিস্তব্ধতার ভয়াবহ শব্দ। সাপের ভয় নতুন করে মনের মধ্যে উদিত হয়, কিন্তু আর সে ভয় করে না; চিত্তের এই অবস্থাকে ভয়ের ওপর জয়ী হবার স্পর্ধা বলা যায় না, ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর যে বিকারহীনতার জন্ম হয়, তার চেতনায় এখন সেই প্রতিক্রিয়াহীন পাথরের আবির্ভাব ঘটে। থেকে থেকে কবাজতে বাঁধা ঘড়ির শব্দ প্রবল হয়ে ওঠে। তাহের নিজের ভেতরে ক্রমশ এক প্রকার ক্রোধের উষাও ছড়িয়ে পড়তে দেখে, এবং তা খানিকটা অসহায় চোখেই সে দেখে; এই ক্রোধ কেন, বা কার প্রতি, তা সহসা বোঝা যায় না; তবে, ক্রোধের আগমনে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা অনেকটা সুসহ বলে প্রতিভাত হয়। আর্দালিটি একবার এসে তাকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। সে তাকে উৎসাহ দেয় না। তবু আর্দালিটি জাঁকিয়ে বসে এবং ঢাকা সম্পর্কে জানতে চায়। আপনাদের ওখানে মিলিটারি কেমন অত্যাচার করেছিল ? ক'জন ছাত্রীকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল ? তাদের কি পরে জীবিত পাওয়া গেছে ? এখানে তো অনেকেরই এ সর্বনাশ হয়। আচ্ছা, সে শুনেছে, ধর্ষিতা অনেক মেয়েই গর্ভবতী হয়, তাদের সন্তানগুলো কোথায় ? আর্দালি তার মতামত প্রকাশ করে যে এইসব সন্তান অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলা আবশ্যক, কারণ জন্তুর ঔরসে যে সন্তানের জন্ম সেও পরবর্তীকালে জন্তুতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। জলেশ্বরীতে এ রকম সন্তান একটিও নেই, এ কথা সে বিশেষ জোর দিয়ে ঘোষণা করে। সে আরো বলে, জারজ এই সন্তানেরাই শুধু নয়, তাদের মায়েরাও বংশের কলঙ্ক। এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা শোনা যায় অবিলম্বে। আর্দালিটি বলে, বহু ধর্ষিতা রমণী জলেশ্বরীতে হয় আত্মহত্যা করে, অথবা নিজেরাও উধাও হয়ে যায়; তারা প্রশংসার পাত্রী, ধীমতি এবং সমাজের গৌরব বিশেষ। ঢাকার কী পরিস্থিতি ? তাহের তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। অবিচল নীরবতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আশ্রয় করে সে হাকিম সাহেবের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে আর্দালিটি উঠে দাঁড়ায় এবং নিরসকণ্ঠে বলে যায়, হাকিম সাহেব কখন ফেরেন, তার কোনো ঠিক নাই, তার মতে অপেক্ষা করাটা নিষ্ফল। আবার সেই অন্ধকার তাহেরের অস্তিত্বের ভেতরে হাতির মত শুঁড় ঢুকিয়ে দেয়, তার হৃৎপিণ্ডকে বেষ্টিত করে টান দিতে থাকে। ছাদে আংটার সঙ্গে ঝুলন্ত তার স্ত্রীর মৃতদেহ অত্যন্ত মৃদু এবং মানসিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অচিরে তা অন্তর্হিত হয় না, অধিকতর উজ্জ্বলতাও তাকে দীপ্তি দেয় না; ছবিটা ফিরে আসে এবং থেকে যায়। হঠাৎ তার বুকের ওপর অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রপাত লাফিয়ে পড়ে, আলোটা যেন দেহপ্রাপ্ত হয়ে তাকে বেঞ্চের সঙ্গে চেপে ধরে, স্ত্রীর ছবিটা তলিয়ে যায়, দৃষ্টির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, সমুখে সে কিছুই দেখতে পায় না।

অবিলম্বে উধাও হয়ে যায়, অন্ধকার যেন একটিমাত্র গ্রাসে উদরস্থ করে ফেলে। আলো বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রের ঘর্ঘর শুনতে পায় এবং অনতিপরে সেটাও থেমে যায়। জিপ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে হাকিম সাহেব নেমে আসে এবং তাহেরের ওপর টর্চের আলো ফেলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। বহুক্ষণ সে অপেক্ষা করছে শুনে আর্দালিকে ডেকে ধমক লাগান। কেন তাকে ভেতরে আলো জ্বেলে বসতে দেয়া হয় নি। তিনি চিৎকার করে জানান যে, তিনি যতক্ষণ আছেন কোনো প্রকার ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন না, প্রত্যেকেরই একটা দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে এবং তিনি চান সে দায়িত্ব পালিত হচ্ছে। তাহের প্রায় হতচকিত হয়ে যায়। তাকে বসতে না দেবার জন্যে এতটা পর্যন্ত শাসন গড়াবে, তার যুক্তি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। হাকিম সাহেব ঘরের ভেতরে লণ্ঠনের শিখা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে পাশে চেয়ার টেনে বসেন এবং জানান যে, দেশে স্বাধীনতা এসেছে সত্য কিন্তু অন্তর্হিত হয়েছে নিয়ম। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখায়, চুল উষ্কখুষ্ক ধুলোর পরত তাতে, ট্রাউজার মথিত এবং কর্দমাক্ত। সাক্ষাৎ করতে আসবার কারণ তিনি তাহেরের কাছে জানতে চান। হাফেজ মোক্তার কবে পর্যন্ত ফিরবেন তা তারও জানা নাই। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন; টাকার ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় সহসা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। একবার এ রকমও বলেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে তাহেরের উচিত হয় নাই স্কুল পরিষ্কারের কাজে হাত দেয়া। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ না করে পারে না তাহের। সম্ভবত তার কণ্ঠে বিরক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবিলম্বে হাকিম সাহেব মাথা দুলিয়ে স্বীকার করেন যে, স্কুল খোলার আগে পরিষ্কার করা অবশ্যই কর্তব্য। তবে, টাকার কী ব্যবস্থা করা যায়। হাকিম সাহেব প্রায় কৈফিয়ত দেবার সুরে বিনীতভাবে নিবেদন করেন যে, সারাদিন তাকে মফস্বলে ব্যয় করতে হয়েছে বিশেষ একটা জরুরি কাজে, সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন, পথ অত্যন্ত খারাপ, পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছেন; হাকিম সাহেব আশ্বাস দেন, কাল একটা ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন, তাহের যেন নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে যায়। অকস্মাৎ তিনি প্রশ্ন করেন, ইস্কুলেই থাকবার ব্যবস্থা করাটা কি সঙ্গত হয়েছে? তাহের বুঝতে পারে না আজ তার হয়েছে কী? যে-কোনো রুথাই তার চিত্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। সে এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সে জানতে চায়, সবাই তাকে ইস্কুলে থাকবার ব্যাপারে এত সন্দেহ প্রকাশ করছে কেন? হাকিম সাহেব আবারো কৈফিয়ত দেবার সুরে জানান, না, তাহেরকে তিনি অন্য কোনো অর্থে প্রশ্নটা করেন নাই; তবে, ইস্কুলে থাকাটা কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না; বরং সে যতদিন ইস্কুলে থাকবে, অন্তত হাকিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাহেব মনে করবেন যে, সে এখনো ইস্কুলের চাকুরিতে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়া স্থির করতে পারে নি। হাকিম সাহেব হঠাৎ উদার হয়ে জানান, তাহেরের স্বাধীনতা আছে যে-কোনো জায়গায় বাসা করবার, তবে নিতান্ত কৌতূহল হয়েছিল বলেই তিনি প্রশ্নটা করেছেন, তাহের যেন কিছু মনে না করে। এই একই সন্দেহ ক্যাপ্টেনও প্রকাশ করেছিল। তাহেরের চিত্তে ক্যাপ্টেন প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে। ক্যাপ্টেন সম্পর্কে তার জানবার কৌতূহল হয় এবং সে স্থির করে হয়ত হাকিম সাহেব কিছু জানাতে পারবেন তাকে। হাকিম সাহেব তার বাবড়িতে দ্রুত হাত ঘষতে ঘষতে জানান যে, ক্যাপ্টেন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তিনি জানেন না; শুধু এটুকু বলতে পারেন যে, ক্যাপ্টেন জলেশ্বরীর ছেলে, মুক্তিযুদ্ধের বছর তিনেক আগে সরকারি চাকুরিতে ঢোকে, বেশ বড় চাকুরি, সম্ভবত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিল সে, তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে ঢাকা থেকে পালিয়ে যায় এবং এই জলেশ্বরীতে এসে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। আপনার সঙ্গে তার আলাপ হলো কোথায়? হাকিম সাহেব সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাহেরের দিকে এবং অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে তার সদুত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রশ্নের সুরেই তাহের অনুভব করে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার আলাপ হওয়াটা হাকিম সাহেবকে কিছুটা সতর্ক করে তুলেছে। তাহের অর্ধসত্য উচ্চারণ করে; সে জানায় প্রথম দিন ক্যাপ্টেন ইস্টিশনে তাকে দেখে নিজেই আলাপ করে এবং হোটেলের পথ দেখিয়ে দেয়। হাকিম সাহেব এ উত্তরে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হন বলে মনে হয় না; তিনি হয়ত মনে মনে অনুসন্ধান করে চলেন, এখন ক্যাপ্টেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার কারণ। অনতিপরে তিনি সখেদে মাথা দোলান ধীরে ধীরে; তারপর আরো ধীরগতিতে উঠে দাঁড়ান আসন ছেড়ে এবং সমুখে উপবিষ্ট তাহের এবং চতুপার্শ্বের অবিচল অন্ধকারের উদ্দেশে তিনি অস্ফুটস্বরে বলেন যে, এই ক্যাপ্টেন হচ্ছে গোলমালের প্রধান সূত্র। হাকিম সাহেবের ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, গোলমালের প্রকার যাই হোক না কেন তার মীমাংসা তার আয়ত্বের বাইরে। তাহের উঠে দাঁড়ায়। সতর্কতার সঙ্গে জানতে চায়, হাকিম সাহেব এ কথা কেন বলছেন? 'খবরের কাগজ তো পড়েন'? হাকিম সাহেব তিক্ত স্বরে এই খোঁচা দিয়ে জানান, যে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অস্ত্র জমা দেবার জন্যে সাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যে সরকারি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও ক্যাপ্টেন বা তার অনুচর কেউই অস্ত্র জমা দেয় নি; পরমুহূর্তে তিনি বক্তব্য সংশোধন করে জানান যে, হ্যাঁ তার অস্ত্র জমা দিয়েছে বটে, তবে সব অস্ত্র নয়; লোক দেখাবার জন্যে সামান্য কয়েকটা রাইফেল আর পিস্তল তার কাছারিতে নিয়ে আসে, কিন্তু আরো মারাত্মক আরো উন্নত বহুবিধ আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছেই রেখেছে এবং এইসব অস্ত্রের সাহায্যে জলেশ্বরীতে বলতে গেলে পাল্টা একটা প্রশাসন খাড়া করেছে। হাকিম সাহেব তাহেরকে এই ভৌগলিক জ্ঞানটিও দেন যে, জলেশ্বরী সীমান্তবর্তী মহকুমা, কাজেই এখানে পাল্টা প্রশাসন থাকার অর্থ অত্যন্ত ক্ষতিকর অরাজকতা বর্তমান থাকা। কঠিন এবং বিরস কণ্ঠে হাকিম সাহেব বলেন, জলেশ্বরীতে এখন কার শাসন চলছে কেউ বলতে পারে না। তিনি আছেন সরকারের প্রশাসনের তরফে, ক্যাপ্টেন হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ, আর হাফেজ মোক্তার, যেহেতু তিনি যে রাজনৈতিক দলভুক্ত সেই দল দেশে এখন সবচেয়ে বড় দল তাই তিনি নিজেকে রাজ-কর্মচারী বা গেরিলাদের চেয়ে শক্তিধর মনে করেন। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে হাকিম সাহেব হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন; আচ্ছা, আপনি এখন যান, কাল আমি একবার ইস্কুলে আসব বলে তাহেরকে আচমকা বিদায় দেন তিনি, লণ্ঠনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আলোয় অস্পষ্ট উদ্ভাসিত পেছনের একটা দরোজা দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হয়ে যান যেন কোন পার্বত্য গুহার ভেতরে ঢোকেন। তাহের বেরিয়ে আসে; কুঠির সামনে একজোড়া তাল গাছের ভেতর দিয়ে সড়কে পৌঁছুবার পথ, সে পর্যন্ত গিয়ে তাহের হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়; কেন দাঁড়ায় তা সে বুঝতে পারে না; তার গা ছমছম করে ওঠে। সমুখে পথ ভাল করে চোখে দেখা যায় না, চেতনা দিয়ে অনুভব করা যায় শুধু, সেই পথের ওপর নরোম ধুলোয় পা পড়তেই প্রসঙ্গহীন একটা উদ্বেগ তাকে নিমেষে বিদ্ধ করে স্থির হয়ে থাকে। তাহেরের মনে হয়, তার কোনো গন্তব্য নির্মম যাদুকর সমস্ত বাড়িঘর অবলুপ্ত করে দিয়েছে, রেখে দিয়েছে পায়ের নিচে এই প্রতারক কোমল পথ। অবসন্ন পায়ে তাহের এগুতে থাকে; বাঁ দিক দিয়ে এগুলে সোজা চৌরাস্তায় পৌঁছে যাবে সে, তারপর ডান দিকে কিছুদূর গেলেই ইস্কুল, সে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ইস্টিশনে। একের পর এক শহীদদের নামাংকিত সব সড়ক; যেন মৃত্যুর রাজত্বের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, পায়ের নিচে এই কোমলতা মৃতমাংসের, মুখমণ্ডলে বাতাসের শীতলতা প্রেত-উপস্থিতির, দু'পাশে গাছের পাতাপত্রে সরসরধ্বনি গূঢ় সংলাপের। ক্যাপ্টেন যে একদা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল, এই সংবাদ তাহের এই পরাবাস্তব পরিস্থিতির ভেতরেও বিস্মৃত হতে পারে না; ক্যাপ্টেনের সংলাপ, মুখের অভিব্যক্তি, চিত্তের বিশ্বাসগুলো খণ্ডিতভাবে এখন তার মনে পড়তে থাকে এবং এখন সহজ হয় বোঝা যায়, তার গ্রামীণ পোশাক সত্ত্বেও প্রথম দৃষ্টিতেই কেন তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে তার মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর ঢাকায় অবস্থানের কারণও এখন সে বুঝতে পারে। তার এক প্রকার সংকোচ হয় যে, ক্যাপ্টেনকে সে অর্ধশিক্ষিত শক্তিমদমত্ত গ্রাম্য যুবক বলে ধারণা করে এসেছে। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারে না। মানুষ সম্পর্কে এক তরফা ধারণা করবার এই প্রবণতা থেকে এখনো সে মুক্ত হতে পারে নি বলে তার অনুতাপ হয়; অনুতাপে সে খিন্ন বোধ করতে থাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পরেই তার বাড়ি লুট হয়ে যায়; তার কষ্টোপার্জিত অর্থে কেনা, দিনের পর দিন সঞ্চিত স্মৃতিতে বর্ধিত মূল্যসম্পন্ন প্রতিটি জিনিস তস্করের হাতে চলে যায়। সেই থেকে বস্তুর প্রতি তার অধিকার বোধ অন্তর্হিত হয়ে যায়; এখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত মনে করতে পারে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থেকে। ঠিক একই প্রকারে মানুষ সম্পর্কেও তার দৃষ্টিভঙ্গির বদল হওয়া উচিত ছিল। মানুষের প্রতি যে প্রকার দৃষ্টিপাত করতে সে আজীবন অভ্যস্ত ছিল তারও আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলেই তার বিশ্বাস ছিল। তার মনে পড়ে যায়, ঢাকায় যখন সে নিজের বাড়িতে থাকা আর নিরাপদ বোধ করে নাই, পরে যখন ঢাকা শহরে থাকাটাই তার কাছে অরণ্যবাসের চেয়েও বিপদসংকুল মনে হয়েছে, সেই তখন আশ্রয়ের সন্ধানে, ঢাকা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পথে, মানুষকে নতুন করে চিনেছে সে; আবিষ্কার করেছে এতকাল স্বাভাবিক বলে যা সে জেনে এসেছে তা কত অস্বাভাবিক, কিংবা পূর্বের প্রতিক্রিয়াগুলোই ছিল অস্বাভাবিক। বস্তুত, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের মধ্যে কোনো প্রকার সীমিত সে দেখতে পায় নাই; বিশেষ মুহূর্তের প্রয়োজনে তার ধারণাকৃত নিয়মের উদ্ধত প্রকাশ্য খণ্ডন সে দেখেছে কতবার। মুক্তিযুদ্ধের পর, পেছনের দিকে তাকিয়ে তাহেরের মনে হয়েছিল তার অতীত সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে তার জীবন থেকে, এবং বিযুক্ত সে অতীত অন্য কারো, তার নিজের নয়; একটা আকস্মিক মৃত্যুর পর তার নতুন করে জন্ম হয়েছে; নতুনভাবে জীবন শুরু করবার জন্যে জাতিস্মর সে স্মরণ করেছে পূর্বে তার জন্ম হয়েছিল যেখানে, সেখানে সে ফিরে এসেছে; অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ বারবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফিরে আসে সূক্ষ্মদেহে তার পরিচিত পৃথিবীতে, এই সংস্কারটি তার নতুন এ অস্তিত্বেও লক্ষ করা যায়, প্রেতাত্মা যেমন অপঘাতের কারণ দূর করতে চায়, সড়ক দুর্ঘটনায় যার মৃত্যু সে প্রেতাত্মা যেমন সড়কের ওপর মধ্যরাতে এসে যানচালককে সতর্ক করে দেবার জন্যে ভয়াবহ নীরব চিৎকার করে ওঠে, তাহেরও তেমনি জলেশ্বরীতে আসে আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে, মানুষের পতন গোড়া থেকে ঠেকাতে, আর তাই জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা সে গ্রহণ করে; নতুন একটা চেতনাকে সে ধনাত্মক করে তুলবে। তার এ ইচ্ছা যদি বালসুলভ বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে গোটা মানবজাতির প্রতিটি স্বপ্নই বালসুলভ; কারণ, সত্য এই যে বাস্তব কখনোই স্বপ্নের অনুরূপ নয়, সম্ভবত বাস্তবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা তখনি যখন বাস্তব স্বপ্নের অভিমুখী হয়ে থাকে। তাহেরের মনে হয়, এই মুহূর্তে তার কল্পনাগত বাস্তব কোনো অর্থেই স্বপ্নের অভিমুখী নয়। এর জন্যে দায়ী করে সে নিজেকে, নিজের পূর্ব সংস্কারগুলোকে, যে সংস্কার তাকে এখনো মানুষ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা গ্রহণ করতে সাবলীলভাবে প্ররোচিত করেছে। ক্যাপ্টেনের প্রতি তার চিন্তা ধাবিত থাকে। চিন্তা যেন একটা দীর্ঘ সপ্রাণ, স্বাধীন রশি, পলকে পলকে অন্তহীন সেই রশি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সবল সরীসৃপের মত বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয় এবং তার পথে যা কিছুই পড়ে সমস্ত কিছুকে চোখের নিমেষে বেষ্টিত করে সে আবার অগ্রসর হয়। আজমীর-পিপাসু যে চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেয় এবং নির্মমভাবে যারা জীবন থেকে অপসারিত হয়, তাদের চোখে না দেখলেও তাহেরের চোখের ওপর অস্পষ্ট চারটি তরুণ মুখ সরসর করে নেমে আসে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎপটে আঁকা চিত্রের মত। চিন্তার রশি মুখাবয়বগুলোকে বেষ্টন করে অবিলম্বে ধাবিত হয় এবং এখন একটি শব্দকে আত্মসাৎ করে নেয়। সে শব্দ আগ্নেয়াস্ত্রের, সেদিন রাতে হোটেলে শুয়ে থেকে যে শব্দটি তাহের শুনেছিল। অবিলম্বে একটা নয়, অনেকগুলো শব্দ শুনতে পায় তাহের; তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, স্মৃতির এ প্রকার আচরণ তাকে হতবিহ্বল করে দেয়। সে রাতে শোনা একটিমাত্র শব্দ, ক্যাপ্টেনের বিবরণ অনুসারে একই সঙ্গে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রের মিলিত শব্দ; এখন বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তারপর হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে যায়। যে নীরবতা দ্রুতবেগে ফিরে আসে তার ভেতরে দাঁড়িয়ে অণুমাত্র স্মরণ করবার উপায় নেই যে একটু আগেই এ নীরবতা ছিল অনুপস্থিত। তাহের সিদ্ধান্ত করে, তার চিত্তের ওপর থেকে নিজের প্রভুত্ব কোনো অজ্ঞাত কারণে শিথিল হয়ে পড়েছে, তাই নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, যার একটি তো এইমাত্র লক্ষ করা গেল, অতীতে শ্রুত একটিমাত্র শব্দের রক্তবীজসম্ভব সংখ্যা বর্ধন। সাপের ভয়ও করতে থাকে তার। মনে পড়ে যায়, জলেশ্বরীতে ছোটবেলায় তার ক্লাসের একটা ছেলেকে সাপে কেটেছিল; একদিন সে আর ক্লাসে আসে নাই; তাহেরের মনে হয়েছিল, ছেলেটি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গেছে, কিন্তু সে ছেলে আর ফেরে নাই। তাহের সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়; মাঝে মাঝে তালি দিয়ে শব্দ করে, সাপ থাকলে সরে যাবে। হঠাৎ আবার গুলির শব্দ শোনা যায়; এবারের শব্দ এক ঝাঁক পাখির মত অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উড়ে যায়। এতক্ষণে তাহের অনুভব করে, আসলে, এখনকার এবং ইতিপূর্বের সমস্ত গুলির শব্দই বাস্তবিক, মানসিক নয়। কয়েকটা সড়ক ওপার থেকে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়, অবিলম্বে সে কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়। গত কয়েকদিনে তাহের গুলির শব্দে এক প্রকার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার পথ চলতে শুরু করে ক্যাপ্টেনের কথা অনিবার্যভাবে আবার তার মনে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিত্তের একটি কোণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে ক্যাপ্টেনের সংকেত ধ্বনি এ-এ-রে-এ-এ শোনার জন্যে। সে ধ্বনি শোনা যায় না। ক্যাপ্টেন কি আজো পাহারায় বেরোয় নি ? সম্ভবত কাল রাতে তার স্ত্রী এসে গেছে। ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায় জানা থাকলে তাহের হয়ত একবার এখন সেখানে যেত। হাকিম সাহেবের মুখে তার পূর্বপরিচয় জানবার পর থেকে ক্যাপ্টেনকে একবার দেখবার ইচ্ছা থেকে থেকেই মনের মধ্যে মাতামাতি করছে। অন্ধকারের ভেতরে অতিকষ্টে হাতঘড়িটা দেখে অনুমান হয়, ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেনকে হয়ত ইস্টিশনে পাওয়া যাবে; মনে হয়, ট্রেনের সময়ে ইস্টিশনে হাজির থাকাটা তার রেওয়াজ; অবিলম্বে ইস্টিশনের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহের। বাঁ হাতে স্কুলটা ফেলে তাহের সেদিকেই এগোয়। এতক্ষণ অন্ধকারে পথ চলবার পর, সে আশা করে, ইস্টিশান পাড়ায় দোকানপাটের উজ্জ্বল আলোয় সে আবার সুস্থ হতে পারবে। কিন্তু, আজ একটি বাতিও দেখা যায় না; সব কটা দোকান বন্ধ এবং প্রত্যাশিত সমস্ত কোলাহল অনুপস্থিত। কেবল মিষ্টির দোকানের সামনে আবর্জনার স্তূপে একটা কুকুর নাক ডুবিয়ে আঁতিপাতি করে খাবার খুঁজছে। একটা কাশির শব্দ পাওয়া যায়। কাঠের দোকানের ভেতর থেকে শব্দটা আসে, এবং বোঝা যায়, ব্যক্তিটি তার বিদ্রোহী কাশিকে আপ্রাণ চেষ্টা করছে থামাতে কিন্তু পারছে না। ইস্টিশান ঘরে এসে দেখে একটা লোক নেই কোথাও। তাহের কি তাহলে সময় ভুল করেছে ? রাতের ট্রেন কি ফিরে গেছে অনেক আগেই ? আবার তার গা ছমছম করে ওঠে। শূন্য প্ল্যাটফরমের ওপর তাহের আরো শূন্য হৃদয় শঙ্কিতভাবে শরীরের ভেতরে ধারণা করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস্তব এবং বিভ্রমের ভেতরেই শুধু সাবলীল স্থান বিনিময় নয়, সময় সম্পর্কে ধারণা তথা অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতে তিনটি তাসের মত পাকা কোনো খেলোয়াড়ের হাতে কেবলি নতুনতর ভিন্নতর বিন্যাস অর্জন করতে থাকে। গোটা জলেশ্বরীকে সত্য সত্যই মৃতের জনপদ বলে মনে হয় তার এবং সেখানে নিজের উপস্থিতিকে মনে হয় ভরাহাটে ঘুমিয়ে পড়া মধ্যরাতে শয্যায় জেগে ওঠা স্থির আতঙ্কে আবৃত কোনো বালকের মত। কাল ভোরে তাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে; কাল ইস্কুল খুলবে; এখুনি তার ঘুমোতে যাওয়া দরকার। অন্ধকার জনশূন্য নিস্তব্ধ প্ল্যাটফরম থেকে তাহের ইস্কুলের দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বহুদূর থেকে সেই গুরুগুরু ধ্বনি ভেসে আসে জলজ দীর্ঘ লতার মত। অবিলম্বে রেলপথের ওপর অতিসূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করা যায়; সে কম্পন ক্রমশ প্রবল হতে থাকে; তারপর রেলপথের ওপরে বাতাসের অশান্ত একটা পাহাড়ি নদীর বাঁধ খুলে যায়, সেই স্রোতধারাকে নির্মমভাবে তাড়িত করে চারদিক কম্পিত করে ট্রেন এসে উপস্থিত হয় বিক্ষুব্ধ দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাহের পেছিয়ে গিয়ে ইস্টিশানের বারান্দায় দাঁড়ায়। মুহূর্তে প্ল্যাটফরম ভরে যায় মানুষের ভিড়ে, একে অপরকে তারস্বরে ডাকবার ধ্বনিতে শিশুর ক্রন্দনে, কুকুরের প্রতিবাদী সবিরাম গর্জনে। ইস্টিশানের আজ টিকেট নেবার জন্যেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। এতক্ষণে তাহের নিশ্চিত হয় যে, ট্রেন আসা সংক্রান্ত সময়ের ভুল সে করে নাই; বস্তুতপক্ষেই কোনো অজ্ঞাত কারণে ইস্টিশান এবং তার চারপাশের প্রতিটি মানুষ উধাও হয়ে গেছে। তাহেরের এখন প্রত্যয় হয়, তারা অন্যত্র চলে যায় নাই, এখানেই আছে, বাতি নিভিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা পড়ে আছে অন্ধকারের ভেতরে গহ্বর সৃষ্টি করে। দু'একজন যাত্রী টিকেট মাস্টারের সন্ধান করে, কয়েকজন বন্ধু মিষ্টির দোকানের সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; অবিলম্বে দেখা যায় ট্রেনের গার্ডকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এনজিনের দিকে ছুটে যেতে; লক্ষ করা যায় গার্ড এবং ড্রাইভারের দ্রুত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মানুষেরা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে যে যার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়, তাদের কোনো প্রকার উচ্চবাক্য শোনা যায় না; নিঃশ্বাস মথিত কর্কশ নীরবতার ভেতরে প্ল্যাটফরম প্রতি মুহূর্তে শূন্য হয়ে যেতে থাকে। অচিরে এনজিনের তীব্র হুইসিল শোনা যায়, গার্ড দৌড়ে তার কামরায় ফিরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে এবং সশব্দে দরোজা বন্ধ করে দেয়। হুইসিল তীব্রস্বরে ছুরিবিদ্ধ আর্তনাদ ছড়িয়ে চলে চরাচরের ওপর, তার সঙ্গে যুক্ত হয় এনজিনের ঘনঘন নিঃশ্বাসপতন, নড়ে ওঠে ট্রেন, সেই হুইসিল সেই নিঃশ্বাস সেই আর্তনাদ অব্যাহত রেখে ট্রেন পেছুতে থাকে। তাহের সহসা বুঝতে পারে, যাত্রীদের মত রাতের এই ট্রেনও জলেশ্বরী থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে। আজ এ ট্রেন এনজিন ঘুরিয়ে সামনে আনবার সময় নষ্ট করতেও সম্মত নয়; পলকে পলকে তার গতি বৃদ্ধি হয়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা যায় ট্রেন মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে লাইনের বাঁকে দু'পাশের জঙ্গলের ভেতরে। তাহের অকস্মাৎ অনুভব করে যে, ইস্টিশানে এসে সে বহির্গামী কোনো যাত্রীকেও দেখতে পায় নি। গোটা ঘটনা তার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও এটুকু সে বুঝতে পারে যে, এরা প্রত্যেকেই কোনো দূর্লক্ষণ দেখতে পেয়েছে, পেয়েছে কোনো মহামারীর আভাস, যা তাহের নিজে পায় নি। এ যেন, নীল পরিষ্কার আকাশের নিচে পদ্মার বুকে কোনো মাঝির হঠাৎ পূর্বাভাস পাওয়া যে কালবৈশাখী আসছে, এ যেন কোনো জন্তুর নিদ্রার ভেতরে সতর্ক লাফ দিয়ে ওঠা যে অরণ্যে মৃত্যুর পদপাত ঘটেছে। তাহের যে এর বিন্দুমাত্র আভাস পায় নি, এতে সত্য সত্যই তার উপলব্ধি হয় যে, বহিরাগত, জলেশ্বরী তার জন্মস্থান হলেও, জলেশ্বরীকে সে পৃথিবীতে অবশিষ্ট তার জন্যে একমাত্র আপন জনপদ মনে করলেও, আসলে জলেশ্বরী তাকে গ্রহণ করে নাই। যদি সে সত্য সত্যই গৃহীত হতো, তাহলে, এখন অন্যান্যদের মত সেও পূর্ব সংবাদ পেয়ে যেত। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভীষণ অবসন্ন বোধ করে এবং ইস্টিশানের বারান্দাতেই অনড় দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছায় নিশ্চেষ্ট সে ভেসে যায়; এ যেন মৃত্যুকে, অবলুপ্তিকে সাদরে ডেকে নেবার প্রেরণা, ঠিক যেমন কোনো কোনো প্রাণী স্বেচ্ছায় সমস্ত উদ্যম বন্ধ করে, শিকার সন্ধান পরিত্যাগ করে অন্ধকার গুহার ভেতরে আরো এক গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষা করে দিনের পর দিন। তার মনে হয়, এভাবে এক অনন্তকাল দাঁড়িয়ে ছিল সে, যখন কোনো নারীকণ্ঠে বিঘ্নিত হয় তার অপনিবিষ্টতা। ব্যাকুলকণ্ঠে নারী তার কাছে জানতে চায়, এই কি জলেশ্বরী ? উত্তর দেবার আগে তাকে ভাল করে দেখার জন্যে তাহের নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনবার প্রবল চেষ্টা করে; তা সুসাধ্য হয় না, তার কণ্ঠে শব্দের আবির্ভাব সহসা ঘটে না। বোবাচোখে সে তাকিয়ে থাকে নারীর দিকে; অন্ধকারেও এক প্রকার আলোর অস্তিত্ব সম্ভব, সে আলোয় নারীর মুখ ঈষৎ ধারণা করা যায়। নারী আরো একবার ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ইস্টিশানে জনপ্রাণীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে; জানতে চায়, আসলেই জলেশ্বরীতে সে নেমেছে কি না। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চিত হয় যে এ নারী ট্রেনে করে এইমাত্র নেমেছে এবং সে নিজে তার অস্তিত্বকে বর্তমান বাস্তবে আবার ফিরে পেয়েছে। নারীর বেশভুষা, সংলাপের ভাষা এবং পায়ের কাছে রাখা সুটকেশ দেখে তাহেরের প্রত্যয় হয়, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী গতরাতে আসে নি, এখন যে তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। কিন্তু গতরাতে সে যদি না এসে থাকে তাহলে আজ তার জন্যে ক্যাপ্টেন কেন ইস্টিশানে আসে নি, এই প্রশ্নটি পলকে তার মনে উদিত হয়। নিশ্চিত হবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জন্যে সে জানতে চায় ক্যাপ্টেন তার স্বামী কি না। তার উত্তরে নারী জানায়, কোনো ক্যাপ্টেনের স্ত্রী সে নয়, সে বিবাহিতা বটে, ঢাকা থেকেও আসছে এবং তার স্বামীর নাম মজহার। ক্যাপ্টেনের পিতৃদত্ত নাম তাহেরের শোনা হয় নি; তার সন্দেহ হয়, মজহার ক্যাপ্টেনেরই নাম। সে নারীকে ক্যাপ্টেনের বর্ণনা দেয়, একদা রাজকর্মচারী ছিল— তাও জানায় যে, বর্ণনা তার স্বামীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বটে। নারী এ প্রত্যয়ও প্রকাশ করে যে তার স্বামী ক্যাপ্টেন নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব। নারী জানতে চায়, ক্যাপ্টেন কোথায়? তাহের অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তার পাল্টা প্রশ্নে নারী জানায় যে, বিয়ের পর সে কখনো শ্বশুর বাড়িতে আসে নাই, অতএব সে জানে না কোন সড়কে সে বাসা। তাহের আত্মপরিচয় দেয় এবং পরামর্শ রাখে যে, নারী যদি ইস্কুলবাড়িতে আসে তাহলে পরাণকে দিয়ে খবর পাঠান সম্ভব, পরাণ অবশ্যই জানবে ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায়। নারী পথে পা দিয়ে স্বগতোক্তি করে যে, ক্যাপ্টেন তাকে নিতে আসবে না এটা তার জানাই ছিল, কারণ দায়িত্বের পরিচয় জীবনে সে দেয় নি। তাহের লক্ষ না করে পারে না যে, বিবাহিতা নারী প্রায় সকলেই স্বামী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের আগাগোড়া জীবন ধরেই টান দেয়, মুহূর্তমাত্র বিবেচনা করে না যে, বিয়ের আগে লোকটি দীর্ঘ একটি জীবন অতিবাহিত করে এসেছে এবং সে অভিজ্ঞতাগুলোর সংবাদ বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় না। হাসনাও তাহের সম্পর্কে এক প্রকার মন্তব্যই করত— তুমি জীবনে এটা করলে না, সারা জীবন দেখলাম তোমার প্রকৃতি এইই, জীবনে তুমি একবার অন্তত এটা করো ইত্যাদি ইত্যাদি। হাসনাকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করাতে গিয়ে ফল হয়েছে বিপরীত। হাসনা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করেছে কখনো কখনো। তাহের অবাক হয়ে লক্ষ করে, হাসনাকে এখন জীবিত বলে ভ্রম হচ্ছে তার, মনে হচ্ছে, কোথাও সে আছে, আর তাহের তাকে ছেড়ে সামান্য দিনের জন্যে এখানে এসেছে কিন্তু হাসনার কাছে ফিরে যাবার কোনো প্রকার তাড়া তার নেই। তার অর্থ কি এই যে, হাসনাকে সে ভালবাসত না? হাসনা তার কাছে এমন কোনো দুর্লভ সম্পদ ছিল না যে তার অন্তর্ধানে জীবন শূন্য হয়ে যায় নি? 'কতদিন ধরে তাকে চেনেন' নারীর এ প্রশ্নে তাহের হঠাৎ বুঝে উঠতে পারে না সে হাসনার কথা বলছে, না ক্যাপ্টেনের? অবিলম্বে তার লক্ষ হয় যে হাসনাকে তার জানার কথা নয়, এমনকি হাসনার কথাই যে সে এখন ভাবছে তাও তার জানবার কোনো কারণ নেই। নারী সে প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে না, পর মুহূর্তে জানতে চায় এখনো কি সে দলবল নিয়ে আছে? তাহের স্বীকার করে যে ক্যাপ্টেন সম্পর্কে তার কোনো তথ্যই জানা নেই; মাত্র দু'বার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সম্ভবত পরিচয়ের এই স্বল্পতা নারীকে বিচলিত করে; পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে ওঠে, এক প্রকার আতঙ্ক অনুভব করে; হয়ত, অপরিচিত এই ব্যক্তির সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধকারী অন্ধকারের ভেতর অপ্রত্যক্ষ কোনো গন্তব্যের দিকে যেতে তার শঙ্কা হয়। অবিলম্বে সে থেমে পড়ে এবং কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চায়, কোথাও কোনো মানুষের সাড়া নেই কেন তাও সে জানতে চায়। তাহের সংক্ষেপে তাকে জানায়, ঢাকার মত বড় শহর থেকে পাড়াগাঁয়ে এলে হঠাৎ এ রকম বোধ হয় বৈকি। তাছাড়া, তাকে যে পথের ওপর একা ফেলে সে যেতে পারে না এটাও সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই সত্যটিও তুলে ধরে যে, কারো না কারো সাহায্য নিয়েই তাকে তার শ্বশুর-বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। ইস্কুলের আপিস ঘরের বারান্দায় পরাণ লণ্ঠন স্তিমিত করে রেখে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরোজা খুলে লণ্ঠনের আলো উসকে দিয়ে নারীকে আসন গ্রহণ করতে বলে তাহের। লণ্ঠনের আলোয় তাহের হঠাৎ উপলব্ধি করে, নারী অত্যন্ত রূপসী; ঠোঁটের বঙ্কিমতায় স্পষ্ট আত্মসচেতনতার বিভাসটুকু ধরা পড়েছে, বসবার ঋজু ভঙ্গিতে উপস্থিতির সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। ইস্কুলবাড়িতে আকস্মিক এই নারীর উপস্থিতি তার কাছে মোহনীয় এক অবাস্তবতা বলে প্রতীয়মান হয়। তাহের নিজের উরুসন্ধিতে ইচ্ছার মৃদু সঞ্চারণ অনুভব করে, অকুস্থল থেকে এক প্রকার উষ্ণতা ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কিছুতেই তাকে সে শীতলতায় পর্যবসিত করতে পারে না। কতকাল স্ত্রীসঙ্গ সে করে নাই; শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল কবে সঠিক মনে পড়ে না। একদিন রাতে বাইরে, দূরে, প্রচুর গোলাগুলি চলছিল, তখন হাসনা তাকে জড়িয়ে ধরে মাঝের ঘরে মেঝের ওপর শুয়ে ছিল; গোলাগুলি থেমে যাবার পর হাসনা হঠাৎ তার অঙ্গে হাত রেখেছিল, প্রথমে মনে হয়েছিল আকস্মিকভাবেই হাতটা এসে পড়ে কিন্তু সরিয়ে নিতে গিয়েই সে টের পায় ইচ্ছাকৃত এ হাত রাখা; সরিয়ে নেবার মৃদু চেষ্টাতে হাসনা তার অঙ্গ চেপে ধরেছিল প্রবল মুঠিতে; হাসনা তাকে সে রাতে চেয়েছিল, তাহেরের অঙ্গও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল প্রার্থিত ক্রীড়ার জন্যে, কিন্তু শরীরের ভেতরে মন নামক স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সত্তাটিকে সে তখন কিছুতেই প্রস্তুত করে তুলতে পারে নাই বরং সেই দুঃশাসনীয় মন তার দেহ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছে হাসনার প্রতিটি আমন্ত্রণের ব্যাকুল চাপে। কিছু পরে আবার হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়, নীরব আর্তনাদ করে ফিরে যায় হাসনার হাত, তাহের নিজেকে আবৃত করে হাসনাকে বুকের সঙ্গে নিবিড় জড়িয়ে ধরে গুলি বর্ষণ থেমে যাবার প্রতীক্ষা করে; অচিরে গুলি থেমে যায়, হাসনার হাত আর ফিরে আসে না। তাহের তখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে হাসনার প্রতি; অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রীড়ায় আবার তাকে টেনে না নিয়ে যাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা; তারা পরস্পরের বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়ে। সম্মুখে উপবিষ্টা রূপসী নারীর সুডৌল বাহু দেখে হাসনার বাহু বলে ভ্রমাবিষ্ট হতে ইচ্ছা হয় তাহেরের; নারীর আঙুলগুলো চিত্তবিক্ষোভের প্রেরণায় আক্ষেপ করতে থাকে; তাহের দাঁড়িয়ে থাকে সম্মোহিতের মত; পরিবেশের অবাস্তবতা গাঢ়তর হতে থাকে। হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে ওঠে তাহের। মস্তিষ্কের মেঝেয় হাসনাকে ধর্ষণ করছে ওরা; তাহেরের কণ্ঠ আশ্রয় করে হাসনার আত্মা চিৎকার করে উঠতে চায়; মুহূর্তে শীতল হয়ে যায় তাহেরের সর্বাঙ্গ, স্বেদ এসে কপালে রাজ্য বিস্তার করে। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সহবাস ইচ্ছা চিত্তে সংক্রামিত হবার জন্যে ক্ষমাহীনভাবে খেদ হয় তার; নিজেকে বিনষ্ট বলে বোধ হয়। অবিলম্বে সে বারান্দায় যায় এবং পরাণের নাম ধরে ডাকে। যতটা প্রবল কণ্ঠে সে ডাকবে ভেবেছিল, তার সিকি অংশ বাস্তবায়িত হয় মাত্র। তীব্র অপরাধবোধ তার কণ্ঠস্বরকে এক প্রকার কম্পনের আরোহী করে রাখে। পরাণের কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। ঘরে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে সে পরাণের বাসার দিকে নেমে যায়। বাসার ভেতরে থেকে অবিলম্বে নড়াচড়ার শব্দ ওঠে। অতি সন্তর্পণে দরোজা খোলার সংক্ষিপ্ত আওয়াজ পাওয়া যায়; সম্মুখের অন্ধকারই যেন অকস্মাৎ সংহত হয়ে পরাণের আকার ধারণ করে। গাঢ় অন্ধকারের ভেতরেও টের পাওয়া যায় পরাণ অত্যন্ত ভীত চোখে তাহেরের দিকে বিস্ফারিত তাকিয়ে আছে। তাহের বিরক্তি প্রকাশ করে যে বহুক্ষণ ধরেই সে তাকে ডাকছে। পরাণ সমান্তরালভাবে সংবাদ দেয় যে, তাহেরের জন্যে বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে, তার ভাত নিয়ে বসে থেকে, তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে করতে এই সবে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুয়ে পড়ছিল। নিরাপত্তার উল্লেখে তাহের কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। পরাণ তাকে জানায় যে ঘণ্টা দুয়েক আগে জলেশ্বরীতে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়। এর অতিরিক্ত কিছু সে বলতে পারে না। তবে, গোলাগুলির শব্দ থেকে যা ধারণা হয়, তাতে বহু লোক নিশ্চয়ই হতাহত হয়েছে এবং প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ক্যাপ্টেন এবং তার অনুচরেরা ছিল একটা পক্ষ, অন্য পক্ষে কারা ছিল সঠিক অনুমান করা খুবই শক্ত। পরাণ আরো জানায়, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, শহরের সমস্ত মানুষ প্রাণভয়ে লুকিয়েছে, এ সময়ে তাহেরেরও উচিত ঘরে বন্ধ থাকা। তাহের এতক্ষণে বুঝতে পারে, হাকিম সাহেবের কুঠি থেকে ফেরবার পথে যে গোলাগুলি শুনেছিল তার কারণ। কিন্তু হঠাৎ এ যুদ্ধ কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ? যুদ্ধটা কি হঠাৎ অনুষ্ঠিত হয়? না, পূর্ব থেকেই এর পরিকল্পনা ছিল?— তা যদি হবে তাহলে কাল রাতে ক্যাপ্টেন যখন এসেছিল তখন তার সংলাপ এবং অভিব্যক্তি স্মরণ করে কোনো সূত্র আবিষ্কার করা কি সম্ভব? হতবিহ্বল হয়ে তাহের দাঁড়িয়ে থাকে। পরাণ নিবেদন করে, তার যদি আহারের ইচ্ছা থাকে তাহলে এক্ষুণি নিয়ে আসতে পারে, তবে তার সুচিন্তিত মত হচ্ছে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকা, কারণ, আবার কী হয় আজ রাত্রে তা বলা যায় না। কাল ইস্কুল খোলা নিয়েও একটা আশঙ্কা তাহেরের মনে ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু আপাতত তাকে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর উপস্থিতি বিচলিত করে রাখে। ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায় তাহের তাহা জানতে চায়। ফিসফিস করে করে পরাণ জানায়, ক্যাপ্টেন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, তবে তার পিতামাতা, তারা অত্যন্ত গরিব, শহরের শেষপ্রান্তে, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা ভাঙ্গা টিনের বাড়িতে তারা থাকে। পরাণ জানতে চায়, ক্যাপ্টেনকে তার কী দরকার? আবারো সে মত পোষণ করে, আজ রাতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবার আশা ত্যাগ করাই ভাল। বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের নিরাপত্তা সম্পর্কেও সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয় তাহের, পরাণকে সে ঘরে ফিরে যেতে বলে এবং নিজে ফিরে আসে আপিস ঘরে। ক্যাপ্টেনের স্ত্রী তার দিকে উৎসুক চোখে তাকায়; নীরব জানতে চায় যাবার কোনো ব্যবস্থা হলো কি না? তাহের তাকে কিছু বলবার আগেই, অতিকাছে, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ ফেটে পড়ে, শব্দটা মিলিয়ে যেতেই বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণের আওয়াজ পাওয়া যায়, তারপর আবার সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। রক্তশূন্য হয়ে যায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর মুখ, টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ায় সে, বিস্ফারিত প্রশ্ন নিয়ে নীরবে সে তাহেরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহের মাথা নাড়ে, আর এই ভঙ্গিতে সে জানিয়ে দেয় যে, তার কোনো ধারণা নেই কোথায় কী হচ্ছে। তাহের বুঝতে পারে, নারীর মনে স্বামীর কথাই প্রথমে উদিত হয়েছে, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র আশঙ্কা তাকে বিদীর্ণ করে যাচ্ছে। তাহের লণ্ঠন স্তিমিত করে টেবিলের নিচে রাখে এবং নারীকে আসন গ্রহণ করতে বলে। ভয়ার্ত কণ্ঠে নারী জানতে চায়, মজাহার এর ভেতরে আছে কি না? মুহূর্তে সে ভেঙ্গে পড়ে, ঝপ করে বসে, টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নারী। ঢাকা থেকে জলেশ্বরীতে আসতে অন্তত দু দিন তার লেগেছে, যাত্রার সেই ধকলের পর এখন এই গুলিবর্ষণে সে হারিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত সাহস এবং দৃপ্ততা। তাহেরের একবার ইচ্ছা হয়, নারীর কাঁধে হাত রেখে তার সাহস ফিরিয়ে আনে, সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হাসনা সংক্রান্ত চিন্তা তাকে পলকে আবার পঙ্গু করে দেয়, এক প্রকার পাপবোধ তাকে পঙ্গু করে দিয়ে যায়। নারীকে সে কাঁদতে দেয়। নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হঠাৎ মুখ তুলে, চোখ মুছে, আপাতদৃষ্টে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানায় যে, ভালবেসে তাদের বিয়ে হয়েছিল, বাবা-মার মোটেই মত ছিল না, কেবল তার জেদেই বিয়েটা হয়, তাই এখন কাউকেই সে দোষারোপ করতে পারে না। আবার তার চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে। তাহের চেয়ার টেনে সমুখে বসে। তার নিজের বিয়ে ভালবাসার পরিণামে আসে নি; সে বিয়ে ছিল আয়োজিত। নারীর ব্যক্তিগত ইতিহাস তার কাছে নতুন কোনো উপন্যাসের মত আকর্ষণীয় বোধ হয়; সে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। নারী তার কৌতূহল অবিলম্বে মেটায় না। প্রশ্ন করে, তার কি কোনো ধারণা আছে, সচ্ছল এবং সুনির্দিষ্ট জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে মানুষ কেন দুঃখের এক অনির্দিষ্ট জীবন বেছে নেয়? অন্য প্রসঙ্গে যার দায়িত্ববোধ এবং নীতিবোধ এত প্রবল, সে কী করে স্বজন তথা জীবনের একমাত্র অংশীদার স্ত্রীর প্রতি এতটা দায়িত্বশূন্য হতে পারে? মজহার কি গতকয়েক মাসে একবারও তার খোঁজ নিয়েছে? অবশ্যই নয়। তাহেরের কী ধারণা, সে জগেশ্বরীতে এসেছে বলে, এবং এই তার প্রথম শ্বশুর বাড়িতে আসা, মজহার খুশি হবে? কখনোই নয়। তা যদি হতো তাহলে ইস্টিশানে সে তাকে এগিয়ে নিতে আসত। তাহের কি জানে, ঢাকা থেকে এই সীমান্তবর্তী ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসতে কষ্টের পরিমাণ কতটুকু? তাহেরের জানতে কৌতূহল হয়, এতটা কষ্ট স্বীকার করে এভাবে তার এখানে হঠাৎ আসবার পেছনে উদ্দেশ্য কী? বিনাদ্বিধায় সে প্রশ্ন করে বসে। সে প্রশ্ন শুনে নারী প্রথমত চুপ করে থাকে, তারপর বলে যে, মজহারকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিতে সে এসেছে। নারী আরো জানায়, তার সাবেক চাকুরি এখনো বহাল আছে, সরকার রাজি হয়েছেন তাকে শুধু আবার গ্রহণ করতেই নয়, উচ্চতর পদমর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে। মজহারকে সে এ সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিল; তার জবাব পাওয়া যায়, চাকুরি সে আর করবে না। আচ্ছা বলুন, নারী জানতে চায়, রাজকর্মচারীর দায়িত্ব কি দেশ-সেবা নয়? তাহলে, মজহারের লক্ষ্যের সঙ্গে চাকুরি গ্রহণের বিরোধিতা কোথায়? বরং তার তো মনে হয়, রাজকর্মচারী হয়েই সে নিজের স্বপ্ন সহজে এবং সংক্ষেপে বাস্তবায়িত করতে পারবে। নারী স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পাকিস্তান আমলে মজহার ঠিক তাই করেছে, চাকুরিতে থেকেই দেশের কাজ করেছে, আর এর জন্যে তাকে ওপরতলার কত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কতবার তাকে বদলি করা হয়েছে এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে, আর যেখানেই সে গেছে সেখানেই সে প্রবলভাবে বাঙালির স্বার্থরক্ষায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান আমলেই সে যদি সরকারি চাকুরিতে থেকে বাঙালির কল্যাণের জন্যে কাজ করতে পারে, তবে আজ দেশ স্বাধীন হবার পর সে কেন সেই সরকারি চাকুরিকেই ঘৃণা করছে? মজহারের মত প্রতিভাবান কর্মীর কতটা প্রয়োজন দেশের স্বাধীন সরকারের তা কি সে বোঝে না? বেশ সেটা না হয় সে সজ্ঞানেই না বোঝার ভান করল, বিয়ের কি একটা প্রধান প্রতিশ্রুতি নয় যে, স্ত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কল্যাণের দিকে স্বামী অবিচলভাবে মনোযোগী থাকবে? বিয়ের কথাও দূরে থাক, বিয়ের আগে যে ভালবাসার দিনগুলো বর্তমান ছিল, তখনো তো পরস্পরের প্রতি প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকাই ছিল একত্রে পা ফেলার একমাত্র সেতুপথ? নারী হঠাৎ জানতে চায়, মজহারের স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে— তাহের তো তাকে সম্প্রতি দেখেছে, দেখে কি মনে হয়, সে ভাল আহারাদি করছে, শরীরের যত্ন নিচ্ছে, ভাল আছে? তার কুশল নিবেদন করতেই নারী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার নতুনতর বক্তব্য হয়— কুশলে তো সে থাকবেই, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মত দায়িত্বশূন্য বিবেকবোধরহিত ব্যক্তিরা নির্মল কুশলেই চিরকাল থাকে। নারী অবিলম্বে জানায় যে, মজহার যখন ঢাকা থেকে পালিয়ে জলেশ্বরীতে আসে এবং মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তখন তাদের একমাত্র কন্যার বয়স মাত্র দশমাস; সেই দুগ্ধপুষ্য শিশুকে নিয়ে যে তার কী ভোগান্তি হয়েছে তা প্রতিভাযুক্ত কোনো বর্ণনাতেই যথেষ্ট প্রকাশ পাবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে নারী; হয়ত সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে স্মৃতিপটে আরো একবার দেখে নেয়, তাহেরও কি সেই দলেরই একজন ? সেও কি তার স্ত্রী পুত্র ফেলে এখানে দেশের কাজে নিয়োজিত আছে ? ম্লান হাসে তাহের। সংক্ষেপে তার একাকীত্বের কথা জানায়, স্ত্রীর আত্মহত্যা করবার কথা অনুক্ত রেখে শুধুমাত্র জানায় যে সে এখন গত। আবার সেই রাতের কথা তীব্র পাখায় তাহেরের বুকের ভেতরে নেমে আসে, যে রাতে বাইরে গুলি বর্ষণের পর হাসনা তাকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, হাসনার হাত অনিচ্ছুকভাবে উত্থিত তার অঙ্গ যে রাতে অধিকার করে রেখেছিল। সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় তাহের, প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বর্তমানে ফিরে আসে, নারীকে সে বলে রাত অধিক হয়ে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেনের সন্ধান আজ রাতে না পাবারই সম্ভাবনা; অতঃপর কর্তব্য নির্ধারণের দায়িত্ব নারীকে দিয়ে সে উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের চতুর্দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নারী অবনত মুখে চিন্তা করে কিছুক্ষণ, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাহেরের দিকে তাকায়। না, সে কিছুই ভাবতে পারছে না। অপেক্ষা ভিন্ন যখন পথ নেই, তখন অপেক্ষা করাটাই কর্তব্যের আকার ধারণ করে। রাত বাড়ে। অন্ধকার অধিকতর শক্তিমান হয় ওঠে। কোথাও কোনো কুকুরের নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে বলে তার আক্ষেপ শোনা যায়। পরাণের ছেলেটি একবার কেঁদে উঠতেই তার পিঠে ধুপ ধুপ করে কিল পড়ে। কিছুক্ষণ পর স্বয়ং পরাণের চাপা ডাক শোনা যায়; দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাহেরকে সে ডাকছে। ভেতরে এসে নারীকে দেখে সে স্বপ্ন না বাস্তব সহসা নির্ণয় করতে পারে না। নারীর পরিচয় পেয়ে বাস্তব তার কাছে আরো স্বপ্নবৎ বলে প্রতীয়মান হয়। তার কাছেই নারী ব্যাকুলস্বরে জানতে চায়, ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার করবার কোনো উপায় কি নেই ? পরাণ জানায় যে, সেটা এই মুহূর্তে এক প্রকার অসম্ভব প্রস্তাব। তার কাছে থেকে শোনা যায়, আগের সন্ধে থেকেই শহরের মানুষ আভাস পেয়েছিল যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। তাহের যখন হাকিম সাহেবের উদ্দেশে বেরিয়ে যায়, তখন সে ইস্টিশানের দোকানপাড়ায় গিয়েছিল সওদা করতে, সেখানেই প্রথম সে ইঙ্গিত পায়। পরাণ এখনো জানে না, লড়াইটা সঠিক কার সঙ্গে; তবে, শোনাশোনা সে কয়েকদিন থেকেই শুনে আসছে যে, সীমান্তে যারা পাট আর ধান চোরাচালান করে নিয়ে যায়, ক্যাপ্টেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ক্যাপ্টেনের পক্ষ সমর্থন করবার সুরে পরাণ বলে, চোরাচালানকারীদের বহুবার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়, কিন্তু সে কথা তারা শোনে নাই, আর শুনবেই বা কেন ?— বহু বহু বড় বড় লোকই দেশের এই শত্রুতাসাধনের সঙ্গে জড়িত। পরাণ বলে, ক্যাপ্টেন ছিল বলেই জলেশ্বরীতে এখনো যা কিছু সুবিচার আছে, লোকের মনে বল আছে যে অন্যায় একেবারে প্রতিকারহীনভাবে পার হতে পারবে না। পরাণ তার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে যে, আজ রাতে ক্যাপ্টেন বোধ হয় সেই প্রতিকার করতেই নেমেছে। পরাণ জানায় এর অত্যন্ত দরকার ছিল, প্রত্যেকেই সাপের পাঁচপা দেখেছিল। পরাণের কথায় নারীর চোখেমুখে এক প্রকার উজ্জ্বলতা ফিরে আসে; সেটা নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেনের প্রশস্তিজাত আলো। গৌরব সকলেই চায়, গৌরব যার ফসল সেই দুঃখের চাষ কেউ করতে চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহের অনুভব করে এই ইতিহাস শ্রবণের পর ঘরে একটা স্বাচ্ছন্দ্য নেমে এসেছে। পরাণ এভাবে আবির্ভূত হয় বলে সে মনে মনে তার প্রতি সন্তুষ্ট বোধ করে। পরাণের এভাবে উদিত হবার কারণ সহসা বোঝা যায় না। যেভাবে সে এসেছিল সেভাবেই সে ফিরে যায়। তাহের নারীকে বলে শয্যায় শুয়ে পড়তে। কুণ্ঠিত হাতে সে শয্যা মসৃণ করে দেয়; জানায় যে রাত শেষ হতে এখনো অনেক বাকি আছে। অনেক অনুরোধের পর নারী সম্মত হয়; তাহের দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে একটা চেয়ার টেনে বসে। খানিক পরেই একটু শীত বোধ হয় তার, ভেতর থেকে চাদর আনবার জন্যে তাগিদ বোধ করে, কিন্তু ভেতরে যেতে গা ওঠে না। ভেতর থেকে নারীর কোনো শব্দ ওঠে না। হাসনার মৃত্যুর পর কোনো নারীর এত নিকটে আর কবে সে ছিল মনে করতে পারে না। তার শ্বশুর অন্য লোক মারফত প্রস্তাব করে ছিলেন, হাসনার ছোট বোনকে তাহের যেন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। অত্যন্ত রুচিহীন বলে সে প্রস্তাব তার কাছে মনে হয়েছিল। শেষবার যে বার গিয়েছিল শ্বশুর বাড়িতে, মাস তিনেক আগের কথা, হাসনার ছোট বোনকে তার শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার শয্যা পেতে দেবার জন্যে, সম্ভবত তাহেরকে আকৃষ্ট করাটাই ছিল শাশুড়ির মনোগত ইচ্ছা। তার ফল হয়েছিল এই যে আর কোনোদিন শ্বশুর বাড়ি না যাবার সিদ্ধান্ত সে নেয়। সে কি আবার কোনো নারীকে তার প্রাঙ্গণে ডেকে নিতে পারবে ?— আবার বিয়ে করতে পারবে কি সে ? মৃত্যুর চলাচলে আবৃত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাহের এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে ভাবতে চেষ্টা করে তার ভবিষ্যৎ দিনগুলো কেমন দাঁড়াবে বলে সে নিজেই মনে করে। একাকী থাকতে পারবে কি সে ? হাসনার সঙ্গে যৌথ জীবন যাপন করতে গিয়ে যে সমস্ত সেবায় সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, আবার তার জন্যে চিত্ত কি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়বে না ? সেই রিকশাওয়ালার কথা মনে পড়ে যায় তার। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে কীভাবে দিনপাত করছে তার পুত্রকন্যা নিয়ে ? তাহের ভাবতে চেষ্টা করে, তার যদি সন্তান থাকত তাহলে সে কী করত ? তাহলে, হয়ত জলেশ্বরীতেই আসা হতো না তার। শিশু সন্তানকে নিয়ে একাকী সে নতুন জীবন শুরু করতে পারত না। তাহলে কি বলতে হবে, সন্তান একটা বাধা স্বরূপ ? রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে তাহেরের। ঐ কবির জীবনে একটা সিদ্ধান্ত সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি ; কবি নিজে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদির কথা আজীবন বলেও নিজের দুই কন্যাকে বিয়ে দেন তাদের অপরিণত বয়সে। সেটা কি স্বার্থপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের ? আজ হঠাৎ এই বারান্দায় বসে তাহেরের দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে যায় যে, ঐ কবি তাঁর কর্মজীবনকে নির্বিঘ্ন রাখবার জন্যই নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদায় করেন সংসারের বাধা তথা তাঁরই কন্যা দুজনকে। তাহেরের যদি কন্যা থাকত, তাহলে সেও কি এভাবে বিদায় করতে পারত তাকে ? না পারত না। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাঁর বিন্দু মাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হয় না। কিন্তু পর মুহূর্তেই সন্দেহ হয়, সে পারত না কারণ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা তার নেই বলেই হয়ত। সম্ভবত প্রতিভাবানেরাই পারে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে। ক্যাপ্টেনের কথা চকিতে উদিত হয়। ঢাকার জীবন তথা স্ত্রীকে সে নির্মম হাতে পেছনে ফেলে এসেছে। কিন্তু কোনো প্রকার সমন্বয় কি সম্ভব নয় সংসার ও কর্মজীবনের মধ্যে ? সংসার কি বৃত্তাকার ? কর্মজীবন একটি আয়তক্ষেত্র ? তাদের ভেতরে উপযোজনের কোনো অবকাশ নেই ? এ লক্ষ্যে কোনো প্রকার উদ্যোগ নেবার শুরুতেই যে কোনো একটির গঠন-সংজ্ঞাকে ভাঙতে হবে এবং অনুরূপ করতে হবে অপরটির। অচিরেই তাহের লক্ষ করে যে তার জ্যামিতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূত্র ধরে এগোচ্ছে; কিন্তু জীবন তো জ্যামিতি নয়, জীবনের আবশ্যিক শর্ত যে সপ্রাণতা, সেই বিশিষ্ট চিরচঞ্চল দিকটি নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করে নেয় ভিন্নতর গঠন-সংজ্ঞা, নিজের গন্তব্য অনুসারী দিকলক্ষ্য এবং গতি। বিশেষ বিভ্রান্ত বোধ করে তাহের। জীবন সম্পর্কে জটিল চিন্তাভাবনা কোনোদিনই তার মনঃপুত ছিল না; বস্তুত যারা সে ধরনের পরিশ্রমে রত থাকে তাদের সে চিন্তাবিলাসী বলেই গণ্য করত। আজ সে ধারণা বদলে নেবার বিশেষ তাগিদ বোধ করে সে; উপলব্ধি করে, চিন্তাই আসলে জীবনযাপনের সার্বক্ষণিক ভিত্তি, অবিকল যেমন জলের ওপরে ভেসে থাকবার জন্যেই চাই নৌকোর নিশ্চিদ্র তলদেশ। তাহের সেই চিন্তারই বিস্তৃত পাটাতনে লম্বমান হয়ে, কোনো এক অদৃশ্য স্রোতের তাড়নায় ভেসে যেতে থাকে সূচীভেদ্য এক অন্ধকার দিকে; কিন্তু দুপাড়ে কোথাও কোনো গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, বিন্দুপ্রতিম কোনো সান্ধ্যপ্রদীপেরও সাক্ষাৎ সহসা পাওয়া যায় না। তবে, এটুকু মনে হয়, এ অন্ধকার নিশ্চল নয়, মৃত নয়; ভয়াবহ একটা গতির স্পন্দন অবিরাম টের পাওয়া যাচ্ছে, অতিকায় কোনো প্রাণীর মত এই অন্ধকার দীর্ঘ একেকটা বিরতির পর নিঃশ্বাস ফেলছে। সহসা স্তম্ভিত হয় নিঃশ্বাস, গতিরহিত হয় পাটাতন, চকিত হয়ে তাহের উঠে বসে; তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে, কারো পদশব্দ শোনা যায়; দ্রুত, তাহের অভিমুখী; তাহের উঠে দাঁড়ায়, তার দেহ প্রস্তুত হয়ে থাকে পলায়নের জন্যে, কিন্তু তার আবশ্যক হয় না; ক্যাপ্টেন লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে আসে। তার পরনে আজ লুঙ্গির বদলে ট্রাউজার, গায়ে হাতাকাটা জামা, পায়ে ভারি জুতো, কাঁধের দু পাশে ঝোলান দুটি ভিন্ন জাতের আগ্নেয়াস্ত্র। এ সজ্জা সম্পূর্ণ নতুন বলে বোধ হয় তাহেরের কাছে; তার স্মরণ হয় রাত্রির প্রথমার্ধে গোলাগুলির কথা; ক্যাপ্টেনকে সম্পূর্ণ অচেনা বলে বোধ হয় তার। ক্যাপ্টেনের মুখে সেই প্রশ্রয়পূর্ণ হাসিটাও আজ অনুপস্থিত, বদলে সেখানে দুর্ভেদ্য কাঠিন্য, ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে তাহেরের সঙ্গে কোনোকালে তার দেখা হয়েছিল। অস্পষ্ট একটা শঙ্কা তাহেরকে ক্রমশ আক্রমণ করতে থাকে। কালক্ষেপ না করে ক্যাপ্টেন জানতে চায় তার স্ত্রী কোথায় আছে। তাহের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আপিস ঘরে ঢোকে এবং হাতের তীব্র টর্চ থেকে শয্যার ওপরে আলো ফেলে; সে আলোয় ঘুমন্ত নারীর দেহ প্রবল অবাস্তব এবং মৃত্যু-শীতল বলে প্রতিভাত হয়। তাহের ঠাহর করে উঠতে পারে না, এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কী এবং তার অবস্থানই বা কোথায় হওয়া সঙ্গত। নিজেকে গোপন করবার প্রেরণা বোধ করে সে; তাহের নিঃশব্দ পায়ে বারান্দার অপর দিকে সরে যায় এবং চেষ্টা করে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্যে। অচিরে ঘরের ভেতরে থেকে ক্যাপ্টেনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। সংসারের প্রতি তার কোনো দায়িত্বের কথা সে সংক্ষেপে অস্বীকার করে, যেন একটা ইস্পাতখণ্ড ঝনাৎ করে মেঝের ওপর পড়ে যায়। অনতিপরে ক্যাপ্টেন দ্রুতগতিতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে এবং চারদিকে তাহেরকে সন্ধান করে; অতিবাধ্য ব্যক্তির মত তাহের এগিয়ে আসে; ক্যাপ্টেন তাকে জানায় যে, আগামীকাল সকালের ট্রেনে তার স্ত্রীকে যেন সে তুলে দেয় অবশ্যই। বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন, তাহের প্রায় তার হাত টেনে ধরে। 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' বাক্যটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাহের উপলব্ধি করে যে, এক মুহূর্ত আগেও এর কোনো পরিকল্পনা ছিল না তার। সিদ্ধান্তটি এতই আকস্মিক এবং মুহূর্তজাত যে, তাহের তৎক্ষণাৎ বুঝে উঠতে পারে না, কী কথা সে ক্যাপ্টেনকে বলতে চায়। তাই ক্যাপ্টেন যখন জানতে চায় তার বক্তব্য তাহের নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পড়ে নীরব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর অপ্রস্তুত একটা অস্পষ্ট হাসি সহযোগে স্খলিত কণ্ঠে জানায়, কথা এক্ষুণি হবার আবশ্যকতা নেই, পরে হলেও চলবে। ক্যাপ্টেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তবু, তাকিয়ে থাকে তাহেরের দিকে এবং অবিলম্বে ঘোষণা করে যে, সে জানে তাহেরের বক্তব্য এবং এক্ষুণি শুনতে সে প্রস্তুত। বারান্দার শূন্য চেয়ারে ক্যাপ্টেন বসে পড়ে তাহেরের কথার অপেক্ষায় তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাহেরের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না যে, বারান্দায় একটাই চেয়ার আছে এবং সেটা ক্যাপ্টেন দখল করে নিয়েছে যখন তাহেরের জন্য বসবার দ্বিতীয় কোনো আসন নেই। বস্তুত সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয় এতে, তার সে ক্ষোভ অচিরে ক্রোধে রূপান্তরিত হতে থাকে; তাহের ঘরের ভেতরে যায় চেয়ার আনতে। ক্রোধ একটা দেয়ালের মত, তাই ক্রোধ আড়াল করে রাখে দুপাশের সমস্ত কিছুকে। তাহের বিস্মৃতই হয়ে গিয়েছিল যে, তার আপিসঘরে এখন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী উপস্থিত এবং শয্যায় সম্ভবত এখন শায়িতা। তাই ঘরে ঢুকে নারীকে দেখেই সে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে যায় এবং অবিলম্বে চেতনা ফিরে আসতেই প্রভূত লজ্জা স্বীকার করে কিছু বলবার চেষ্টা করে এবং একটা চেয়ার নেবার জন্যে হাত বাড়ায়। নারী শয্যার ওপর বসেছিল, সে উঠে দাঁড়ায় এবং জানতে চায়, ক্যাপ্টেন কি চলে গেছে ? তাহের নীরবে চোখের দিক পরিবর্তন করে বারান্দার প্রতি ইশারা করে। নারী সেদিকে বিনাকালক্ষেপ ধাবিত হয়। বিমূঢ় হয়ে তাহের একাকী দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের ভেতরে আবার সে বুঝতে পারে না, এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কী ? বারান্দায় যাওয়া ? না, ঘরে থাকা ? আগেকার সেই ক্রমবর্ধমান ক্রোধ অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং তার বদলে এক প্রকার খিন্নতা তাকে শীর্ণবাহুতে আলিঙ্গন করে ধরে। সে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। নিজেকে মনে হয় কোনো অদৃশ্য বলবান ব্যক্তির হাতে পুতুলের মত; অনিচ্ছার সঙ্গে সে লক্ষ করে যে, জলেশ্বরীতে আসবার সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ তার নিজের, কিন্তু এখানে আসবার পর কোনো কিছুই সে নিজের ইচ্ছা দ্বারা চালিত করতে পারছে না; বরং এই ক'দিনে প্রতিটি ঘটনা যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাচ্ছে, তেমনি অনিবার্যভাবেই স্পর্শ করে যাচ্ছে, তার চলাচলকে আশাহীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। তার চিত্তের ভেতরে আক্ষেপের সঞ্চার হয়, যে আক্ষেপ একজন বন্দির, যার হাতে পায়ে শেকল এবং সে বন্ধন মোচন করা যার সাধ্যের অন্তর্গত নয়। আবার সেই জ্যামিতিক সমস্যাটি তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে; বৃত্ত এবং আয়তক্ষেত্র। কিন্তু এবার এই সত্যিটিও তার সমুখে উপস্থিত হয় যে, এ সমস্যা তার নয়, সে এ নিয়ে ভাবছে কেন ? তার তো সংসার নেই। তার সমুখে এখন নিরবচ্ছিন্ন কর্মেরই অবকাশ এবং সে দ্বিতীয়বার সংসার করতেও যাচ্ছে না। তার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কেন সে এ সমস্যা নিয়ে এত দীর্ঘকাল ব্যয় করেছে এই কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত। তার স্মরণ হয়, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে দেখে হাসনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তার, বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর জন্যেই তার এক প্রকার বাসনা জাগরিত হয়েছিল, আর সেই বাসনাই তার চিত্তে কখন বাস্তব সম্ভাবনার আকার ধারণ করে তাকে প্ররোচিত করেছে ঐ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ভাবিত হতে। তাহের আবারও কুণ্ঠিত হয়ে যায় এই কথা ভেবে যে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে সে আকাঙ্ক্ষা করেছে, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও। যদি কোনো অবস্থায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রী তার প্রাপনীয় হয়ে দেখা দেয় তাহলে সে হয়ত আবার সংসার করতে সম্মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সংসার সম্পর্কে তার মূলত কোনো বিরাগ নেই, সংসার যাকে অবলম্বন করে সেই ব্যক্তিটির অভাবেই সংসারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতি তার এ বৈরাগ্য। তার শ্বশুর যে প্রস্তাব করেছিলেন তারই স্ত্রীর কনিষ্ঠাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে, সেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে তার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতে না পারবার দরুন, সংসারের প্রতি অনীহার দরুন নয়, এমনকি হাসনার প্রেমের স্মরণেও এ প্রত্যাখ্যান নয়। তার আবার মনে পড়ে যায় সেই রিকশাওয়ালার কথা। আবার কি সে বিয়ে করতে প্রস্তুত, কিংবা উদগ্রীব! তাহেরের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় রিকশাওয়ালার সঙ্গে দেখা করা; তার পরম কৌতূহল হয় ঐ সাধারণ মানুষটির ভাবনার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা মিলিয়ে নেবার। তাহের বিস্ময় অনুভব করে অত্যন্ত গভীরভাবে; আবার সে বিবাহিত হতে প্রস্তুত যদি তেমন ব্যক্তির আবির্ভাব কোনোকালে ঘটে কিন্তু অচিরেই তার মনে হয়, ব্যক্তি আপনা থেকেই আসে না, তার আসবার পথ সুগম করে রাখতে হয়, তাকে আবাহন করতে হয় এবং নিজেকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির ভেতরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। অতএব, সিদ্ধান্ত কি এই যে, তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে ? ঘরের ভেতরে ক্যাপ্টেন এসে ঢোকে, এবং তারই কথার সমর্থনে জানিয়ে বলে, হ্যাঁ। তাহের বুঝতে পারে না, তার চিন্তারই উত্তর এটা কি না। পরক্ষণেই ভ্রান্তি দূর হয়। ক্যাপ্টেন জানায়, হ্যাঁ, তার স্ত্রীকে সে যেন কালই ঢাকাগামী গাড়িতে তুলে দেয়। ঘরের ভেতরে তার স্ত্রীকে দেখা যায় না। ক্যাপ্টেন আরো জানায়, তাহেরের সঙ্গে সে আগামীকাল কথা বলতে আসবে। জুতোর শব্দ তুলে ক্যাপ্টেন উধাও হয়ে যায়। অচিরে রাস্তার ওপার থেকে তার সেই পরিচিত সংকেতধ্বনি ভেসে আসে; এ-এ-রে-এ-এ; একাধিক পদশব্দ ওঠে; তারপর সব মিলিয়ে যায়; যেন মানুষের চলাচল অন্তর্হিত হবার অপেক্ষায় ছিল গাছের প্রতিটি পাতা, তারা এখন আবার মুখর হয়ে ওঠে; অবিরাম শুধু পাতার ভেতরে বাতাসের সরসর ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। তাহের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী বারান্দায় থামে একটা হাত রেখে মূর্তির মত অকম্প চোখে দূরে তাকিয়ে আছে। তাহের কাছে আসতেই নারী সেই একই দিকে দৃষ্টি রেখে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করে, না, সে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ তাহেরের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে জানতে চায়, কোথায় সে ফিরে যাবে ? তাহের তাকে ঘরের ভেতরে আসবার আমন্ত্রণ জানান ছাড়া আর কোনো বাক্য নিবেদন করতে পারে না। ঘরের ভেতরে সহসা যেতে নারীকে প্রস্তুত বলে মনে হয় না। নারী দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জ্ঞাপন করে যে, ক্যাপ্টেনকে নিয়েই সে ঢাকায় ফিরবে এবং তার এ প্রতিজ্ঞার সাক্ষী থাকতে তাহেরকে সে প্রস্তাব দেয়। তাহের মৃদু হাসে এবং 'আচ্ছা সে দেখা যাবে' বলে আবার তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ জানায়। নারী ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করলে তাহের বিনা ভূমিকায় তাকে জানায় যে, তার স্ত্রীর সঙ্গেও তার নিজের বহু বিষয়ে মতান্তর হয়েছে এবং প্রতিবারই দেখেছে সেটা খুব স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই; অতএব, বিচলিত না হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। নারী এতে আশ্বস্ত বোধ করে কি না বোঝা যায় না, এক প্রকার ভাবিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে কোনো বিশেষ কিছুর দিকে নয়। তাহেরের মনে হতে থাকে, সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে এখন যেন একটা মীমাংসায় তা মৃদু হয়ে এসেছে, আবার সব কিছু সহজ এবং সুখাতে প্রবাহিত বলে মনে হচ্ছে। তাহের স্বীকার করে নেয় যে, নারী ঢাকা ফিরে যাবে না, তা ক্যাপ্টেন যতবার ইচ্ছে বলুক এবং তার, তাহেরের, নিজের এ বিষয়ে কোনো করণীয় বা দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ প্রশ্নও তার মনে উদিত হয় যে, নারী থাকবে কোথায় ? এ ইস্কুল ঘরে বাসা নেয়া অসম্ভব; জলেশ্বরীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো আবাসিক হোটেল নেই; এবং নারীর কোনো বন্ধুও নেই এখানে যে তার বাসায় গিয়ে উঠবে। সমস্যাটি উত্থাপন করতেই নারী বাঁ হাতের একটা দ্রুত ভঙ্গিতে তা উড়িয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, তার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না, সে নিজেই নিজেকে দেখতে পুরোপুরি সক্ষম। অতএব, তাহের তার সমুখে অতঃপর নীরবে বসে থাকে। তার ভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়; বস্তুতপক্ষে নারীর উপস্থিতিও তার চোখের ওপর ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে; হাসনার স্মৃতি-সাগর সে দেহ নিমজ্জিত করে এক নবারুণের মুখোমুখি নিজেকে স্থাপিত করে। ভোর হয়ে আসে। পরাণ সন্ত্রস্ত চোখে উঁকি দেয় এবং জানতে চায় চা লাগবে কি না। এরই মধ্যে অন্ধকার কেটে গেছে, আকাশ একটা নিভাঁজ ধূসর চাদরের মত দেখাচ্ছে, এটা তাদের দুজনকেই কিছুটা বিস্মিত করে; তারা দুজনেই পরস্পরের দিকে স্মিতমুখে একবার তাকায় এবং স্বস্তি অনুভব করে। ইস্টিশান থেকে পরাণ এসে জানায় যে, কোনো চায়ের দোকান খোলা নেই মনে হয় আজ আর খুলবে না, অতএব চায়ের ব্যবস্থা করা গেল না। দোকান খোলা নেই শুনে তাহের অকস্মাৎ কিছুটা দুশ্চিন্তার স্পর্শ অনুভব করে। গতরাতের গোলাগুলির কথা আবার তার মনে পড়ে যায়; সম্ভবত সেই খণ্ডযুদ্ধের স্মৃতি এখনো জলেশ্বরী ভুলতে পারে নি; এখনো নিঃশ্বাস স্তম্ভিত করে এ শহর অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের। কিন্তু এ আশঙ্কা সে নারীর কাছে ব্যক্ত করে না। পরাণ বিদায় নিতেই নারী জানায় যে, প্রাচীন কাব্যে উপেক্ষিত স্ত্রীকে যে পদদলিতা সর্পিণীর সঙ্গে তুলনা করা হতো সেটা মিথ্যা নয়; নারী ঘোষণা করে যে, তার সংসার রক্ষা করবার যুদ্ধ আজ প্রভাত থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং সর্বশক্তিপ্রয়োগ করে সে যুদ্ধ করে যাবে। অন্যমনস্কভাবে তাহের তার কথাগুলো শোনে, কিছুটা বোঝে, অধিকাংশই গুঞ্জন ধ্বনির মত তার চারপাশ পাক খায়। তাহেরের মনোযোগ এখন ইস্কুলের দিকে, আজ ইস্কুল খোলার দিন। কোনো একটা ছুতোয় সে উঠে পড়ে এবং পরাণকে তার বাসা থেকে বের করে আনে, অবিলম্বে সমস্ত বেঞ্চি চেয়ার টেবিল থেকে ধুলো মুছে ফেলবার নির্দেশ দেয়। তারপর নিজে সে পোশাক বদলে তৈরি হয়ে নেয়। দশটায় ইস্কুল বসবে। সিঁথি করতে করতে সে নারীকে জানায় যে আরো একবার সে ভেবে দেখুক সকাল দশটার গাড়িতে ঢাকা ফিরে যাবে কি না। নারী প্রত্যয়ের সঙ্গে অসম্মতি জানাতেই তাহের প্রস্তাব করে, তাহলে আপাতত সে দিনটা এখানেই কাটাতে পারে, ইস্কুল খোলার ব্যস্ততায়, ছাত্রদের ভিড়ে হয়ত তার দিনটা ভালই কাটবে। পরাণ এসে জানতে চায়, গরম চাট্টি ভাত করে দেবে কিনা। তাহের ক্ষুধার্ত বোধ করলেও নারী আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না বলে তাকেও বিরত বোধ করতে হয়। তাহের নিজের শয্যা গুছিয়ে, কামরাটিকে ভদ্রস্থ করে বারান্দায় দুটি চেয়ার রাখে। নারীকে সেখানে এসে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাহের হঠাৎ প্রফুল্লকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে নারীর নাম তার এ পর্যন্ত জানা হয় নাই। নারী বারান্দায় বেরিয়ে এসে জনহীন মাঠের ওপারে স্তব্ধ সড়কের দিকে কিছুকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে যে তার নাম হাসনা। হাসনা তার চারদিকে হঠাৎ এক অসমান্য নীরবতার আবির্ভাব অনুভব করে তাহেরের দিকে ফিরে তাকায়; দেখে, বিস্ফারিত চোখে তাহের তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই তাহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং দুর্বোধ্য একটা অব্যয়ধ্বনি করে ঘরের ভেতরে ত্রস্তপায়ে চলে যায়। তার দৃষ্টিপাত এবং তিরোধান হাসনাকে আলোড়িত করে দিয়ে যায়; সে বুঝতে পারে না লোকটার হঠাৎ এ হেন আচরণের তাৎপর্য কী হতে পারে। ভ্রু কুঞ্চিত করে হাসনা খানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু মন নিবিষ্ট করতে ব্যর্থ হয়; মজহারের তীব্র উচ্চারণগুলো এখনো তাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। হাসনা সংক্ষিপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় বসে; লক্ষ করে তাহের ঘর থেকে বেরিয়ে নিমিষে কোথাও নিজেকে আড়াল করে ফেলে। হাসনা নিশ্চিত হয় যে, তাহের যে কারণেই হোক তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। বিদ্রূপাত্মক একটা হাসির সূক্ষ্ম রেখা তার ঠোঁটের পাড় ঘেঁসে ফুটে ওঠে; সে নিশ্চিত হয় যে মজহারের ধমকে তাহের কাবু হয়ে পড়েছে। মজহার যে তাকে আজ সকালের গাড়িতে তুলে দিতে বলেছে এবং হাসনা যে ঢাকা ফিরে যাবে না বলে ঘোষণা করেছে— এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে তাহের এখন সংকটের করাতে বিভক্ত হচ্ছে, এ বিষয়ে হাসনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু, তাহেরের ঐ চকিত দৃষ্টি, সেটা সম্পূর্ণ খাপছাড়া মনে হয়; হাসনা কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারে না যে ঐ দৃষ্টিপাতের অর্থ কী হতে পারে। যদি বর্তমান প্রসঙ্গ বিযুক্ত রেখে চিন্তা করতে হয়, তাহলে হাসনা ধরে নিতে পারে যে, তাহের তার প্রতি সহসা এক অন্তরঙ্গ আকর্ষণ বোধ করছে, সহসা একটা সেতু অপ্রত্যাশিত দুই প্রান্তকে আলিঙ্গন করেছে, সহসা একটা অভাবিত বর্ণের প্রলেপে এই বর্তমান চেনার বাইরে রঞ্জিত হয়ে গেছে। সেটা কী করে সম্ভব ? তবে, সম্ভবপরতা বিচার এখন ঘটনা সম্পর্কে তাকে নিরাসক্ত রাখে না। অবিলম্বে হাসনা তার ব্যক্তিগত সমস্ত সমস্যা বিস্মৃত হয় এবং সদ্যোজাত কৌতূহলসহকারে তাহেরের কথাই ভাবতে থাকে। বস্তুত, মানুষ সর্বক্ষণ অপরের দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে, অপরের হৃদয়, অপরের মনোযোগ, অপরের উদ্যম তার নিজের প্রতি। হাসনার অপেক্ষা সফল হয় না; অচিরে তাহের তার সমুখে আসে না : হাসনা বিস্মিত হয়, এই মুহূর্তে তাহের ভিন্ন আর কাউকে সে ভাবতে পারছে না কেন ?— আর কেউ বলতে যে তার স্বামী মজহারের কথাই বলা হচ্ছে, সেটাও তার কাছে একেবারেই স্পষ্ট হয় না। চারদিকের অভূতপূর্ব স্তব্ধতা তাকে বিচলিত করে না, সে অপেক্ষা করে, সে কার অপেক্ষা করে ? তাহের অথবা মজহারের ? রাতে গোলাগুলি চলবার বিষয়টিও সে অচিরে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, একটি সংবাদের প্রতীক্ষা করে; এবং সেই মুহূর্তের ভেতর তাহের দ্রুত দৌড়ে এসে যখন জানায় যে, গতরাত্রে গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন নিহত হয়েছে, তখনো সে স্মিতমুখেই বসে থাকে। হাসনার চোখে, হাসনার ঠোঁটে, হাসনার চিবুকে কিছুকাল থেকেই যে স্মিত আলোক প্রতিফলিত হয়েছিল, তার সূত্র বা উৎস কী সে নিয়ে অতঃপর বহু বিতর্ক হবে, কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ, নিদারুণ তো বটেই, কারণ এ তারই বৈধব্যের সংবাদ, এই সংবাদ পাবার পরেও স্মিতমুখটি অবিকল একই প্রকার থেকে যাবার রহস্য তাহেরের কাছে কোনোদিনই উন্মুক্ত হবে না এবং এটিও তার কাছে এক বিরাট রহস্য হয়ে থাকবে, যে, এই নারী তারই বিগতা স্ত্রীর সঙ্গে একটি নামে যুক্ত ; সে নাম হাসনা। একদিন এক হাসনাকে ফিরে এসে ফাঁসির দড়িতে লম্বমান দেখতে পায় ; একদিন এই হাসনাকে সে দেখতে পেল স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্মিতমুখে বসে থাকতে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে তাহের তাকে তিরস্কার করে ওঠে, সরাসরি তিরস্কার নয়, তিরস্কারের আকার যেন একটি ধূমকেতু, বড় দ্রুতবেগে তা লক্ষ্যবস্তুর দু দিকে চিরে ধাবিত; বড় দীর্ঘ সেই ধূমকেতুর পুচ্ছ; তাহের জানায়, পরাণের কাছে সে শুনেছে, এবং পরাণ এইমাত্র ইস্টিশানের দোকান থেকে শুনে এসেছে, যে, হাফেজ মোক্তারের দলই মজহারকে খতম করেছে। হাসনা তবুও সেই তাকিয়ে থাকে, স্মিতমুখে। আমরা তো কেবল উপরিতল দেখে থাকি, অন্তঃস্থল কখন ধারা বদলে যায়, রঙ বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যায়, গতি বদলে যায়, আমরা সে সংবাদ রাখি না। নারীর নাম ধরে, কিংবা তার বিগতা স্ত্রীরই নাম ধরে তাহের এখন চিৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে— মৃতকে এখানে কেউ স্মরণ করে না; জীবিতকে এখানে কেউ সম্মান করে না। সমুখের এই নারী এখন তাহেরের উচ্চকণ্ঠের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে যেন ততোধিক উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে এবং জানায়, সে এই কথা জানায়, যে, বাহ, এই তবে স্বাধীনতা ? এরই জন্যে স্বাধীনতা ? অকস্মাৎ একটি বিস্ফোরণের শব্দ হয়; উভয়ে যদি আপন আপন জগতে বন্দি না থাকত, তাহলে দেখতে পেত তার আগে, ঐ প্রচণ্ড শব্দের আগে একটি আলোর ঝলক; ধোঁয়ায় সমস্ত কিছু ঢেকে যায়; পরাণের গাভীটি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মাঠ দিয়ে দৌড়ে যায়; সন্দেহ থাকে না যে ইস্কুল বানচাল করবার জন্যেই বোমা কেউ ফাটিয়েছে। শব্দের অনুরণন তখনো মিলিয়ে যায় নি, তারই ভেতর থেকে ভিন্ন একটি ধ্বনি শোনা যায়, জলেশ্বরীর ইস্টিশানে ট্রেনের হুইসিল, যেন বা মিকাইলের শিঙা, ধোঁয়ার জন্য এমত বোধ হয় এ জগতে তারা দুটি প্রাণী ভিন্ন আর কেউ জীবিত নেই; তাহের নারীর হাত ধরে প্রবল টান দেয়। 'চলুন'। নারী উত্তর দেয়, বক্তার হাত ছাড়িয়ে, নিজেই আবার বক্তার হাত চেপে ধরে, 'না'। অচির কালের মধ্যে পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে দ্বিতীয় একটি বিস্ফোরণ ঘটে।